পাতালপুরী অভিযান

শিশিরকুমার মজুমদার

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

PATALPURI ABHIJAN

an adventure story,

by SISIRKUMAR MAZUMDAR

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

তৃতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর, ১৯৬১

প্রচ্ছদ :
সন্দীপ রায়

অলংকরণ :
সত্যজিৎ রায় ও সুবীর রায়

মুদ্রক :
বি. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০ ০৭৩

স্নেহের দিলীপ, মঞ্জু-কে
মেজমামা
ও
স্নেহের দিয়া-কে
মেজদাদু

এই লেখকের অন্য বই

আকাশে আগুন পাতালে আগুন

সিন্ধুতলের সন্ধানী

তুফান দরিয়ার পরান মাঝি

পাতালপুরী অভিযান

[এক]

অফিস থেকে ফিরে এসে টেলিগ্রামটা পেয়ে অবাক হলাম। ওটা পাঠিয়েছে বোম্বাই থেকে আয়াজ। লিখেছে, 'লম্বা ছুটি নিয়ে চলে আসুন। জরুরী!'

ঠিকানাটা দেখলাম লোপেস আলবুকার্কের!

ব্যাপারটা যে কি, বুঝে উঠতে পারলাম না। জরুরী ব্যাপার তো লোপেস নিজে টেলিগ্রাম করল না কেন? যদ্দুর জানতাম, আয়াজ তার নতুন কেনা পাওয়ার বোট নিয়ে একাই নারকেল আর নারকেলের ছোবড়ার চালানি কারবার করছিল। ওর হঠাৎ এমন কি জরুরী দরকার পড়ল যে আমাকে ছুটে যেতে হবে? বেশ ভাবনায় পড়লাম। অফিস থেকে ছুটি নয় পাওয়া যাবে। বোম্বাই যাওয়াও এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

পরদিন আর-একখানা টেলিগ্রাম পেলাম লোপেসের কাছ থেকে। ঐ এক কথাই লিখেছে, 'চলে এসো। তাড়াতাড়ি!'

ভাবনা ছেড়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা দিলাম। লোপেসের ডাক যখন, বিরাট একটা এ্যাডভেঞ্চার আছে নিশ্চয়ই। আর সে এ্যাডভেঞ্চার সমুদ্রকে কেন্দ্র করেই, নইলে আমার ডাক পড়বে কেন!

বোম্বাইতে নেমে মালপত্র হোটেলে রেখে ট্যাক্সি নিয়ে লোপেসের বাড়িতে পৌঁছালাম দুপুরবেলা।

বেল বাজাতেই দরজা খুলে হাসিমুখে সামনে দাঁড়াল আয়াজ, 'আপনি যে আসবেন, তা আমি জানতাম। আসুন ভেতরে। ঘরে সবাই আছেন।'

আমি বললাম, 'ব্যাপার কি? এতো জরুরী তলব কেন?'

'এসে বসুন আগে, অনেক কথা আছে। সব কিছু আমি

আপনাকে গুছিয়ে বলতে পারবো না। গুরুজী আছেন। তিনিই বলবেন!'

ওর কথা শুনে ভীষণ অবাক হলাম। গুরুজী? তিনি আবার কে? তাঁর কাছে কি শুনতে হবে? সাধু-সন্ন্যাসীতে আমার তেমন বিশ্বাস নেই। সাচ্চা যাঁরা, তাঁরা তো লোকালয়ে থাকেন না। যাঁরা থাকেন, তাঁরা অন্তত কোনো এ্যাডভেঞ্চারের কারণ হতে পারেন না।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, লোপেসের বৈঠকখানা জুড়ে বসে আছেন আমার পরিচিত এ্যাফোন্সো আলবুকার্ক, ডাক্তার কাইকোয়াড়, লোপেস আর গেরুয়া-পরা একজন মাঝবয়সী সন্ন্যাসী।

আমাকে দেখে ওরা সবাই খুশি হলেন। লোপেস তো বলেই ফেলল, 'ব্যস্, এখন যাত্রার দিন ঠিক করে ফেলা হোক্ খুড়ো। মিছিমিছি দেরি করা আমার ধাতে সয় না। বন্দুক সাফ করাই আছে। এবারে সাগরে তিমি শিকার করবোই করবো। মানুষখেকো মেরে মেরে কাঁধে ব্যথা ধরে গেছে।'

এ্যাফোন্সো সাহেব গম্ভীরভাবে বললেন, 'আঃ, থামো লোপেস, মিস্টার রয়কে বসতে দাও। শুনতে দাও সব কথা আগে। যাওয়া উচিত হবে কিনা সে বিচার হোক্। তারপর যাত্রার দিন ঠিক করা যাবে।'

আমি একটা চেয়ারে বসতেই গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী বললেন, 'দোহাই এ্যাফোন্সো সাহেব, যাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ রাখবেন না। আপনাদের যখন পেয়েছি, টেনে নিয়ে যাবো নিশ্চয়ই। বুঝতে পারছেন না, কী ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে! আমার অনুমান যদি সত্যি বলে প্রমাণ করতে পারি, তবে এদেশের এক অতি পুরনো রহস্যের সমাধান করতে পারবো আমরা। প্রমাণ করতে পারবো রামায়ণে যা লেখা হয়েছে তার সবটাই মহাকবি বাল্মীকির কল্পনাপ্রসূত নয়। অনেকটাই সত্যি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সমস্ত ব্যাপারটা যে কি, খুলে বলবেন? আপনাদের সবার কথা ভীষণ হেঁয়ালী-ভরা!'

আয়াজ বলল, 'আমিই তাহলে প্রথম থেকে বলি। আপনি তো জানেন ছোটসাহেব, আমার নতুন পাওয়ার বোট নিয়ে আমি মাল চালানের কাজ করি। এও তো জানেন, বড়সাহেব আমাকে তাঁর দমের মুখোশগুলো দিয়েছেন। তা নিয়ে মাঝে মাঝে সাগরের তলে ডুব দিই। আমার বোট তখন তীর থেকে বেশি দূরে রাখিনা। খুঁজে বেড়াই জলের নীচের সেই মুক্তো খাঁড়ি।'

থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'মুক্তো খাঁড়ি কি তুমি খুঁজে পেয়েছ?'

'না সাহেব, তা পাইনি। মালাবারের সাগরতীরের কাছে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়ের একটা বাহু নেমে গিয়েছিল জলের মধ্যে। মাসখানেক আগে সেই বাহুর ধার ঘেঁষে ডুব দিয়ে বেশ কিছুটা নেমে যাবার পর হঠাৎ দেখলাম জলের তলায় এক জায়গায় পাহাড়টা যেন হঠাৎ খাড়া দেওয়ালের মতো সোজা নেমে গেছে। কাছে গিয়ে অবাক হলাম। ঐ খাড়া দেওয়াল মানুষের হাতে কাটা পাহাড়ের ধার ছাড়া আর কিছুই নয়! জলের তলায় কেনই-বা মানুষ অমন করে পাথর কাটতে যাবে, বুঝতে পারলাম না। কতো দূর নেমে গেছে দেওয়ালটা দেখবো বলে আরও বেশ কিছুটা নামতেই নীচে মস্তো একটা চাটান দেখতে পেলাম, তাও মানুষের হাতে কাটা! চাটানে নেমে থম্‌কে গেলাম! সামনেই পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে বিশাল এক সুরঙ্গ মুখ আমাকে যেন হাঁ করে গিলতে চাইছে। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। পালিয়ে আসব ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ নজরে পড়ল, সুরঙ্গ-মুখের দু-পাশে পাথর খোদাই করা বিশাল দুটো পাহারাদারের মূর্তি যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে! সুরঙ্গের মুখও বেশ পাথর কেটে নক্সা করা। ব্যাপারটা যে কি, বুঝতে পারলাম না। ভয় হলো

ভীষণ, নিজেকে আর কিছুতেই ওখানে রাখতে পারলাম না। জলে ভেসে উঠে বোট ছেড়ে দিলাম। অনেকটা চলে আসার পর মনে হলো কাজটা ঠিক করিনি। সব কিছু ভালো করে দেখে আসাই উচিত ছিল। ঠিক ঠিক খবর নিয়ে আপনাদের জানাতে পারলে এ রহস্য উদ্ধার হতো।

ফেরার পথে ঝড় উঠল। সে জায়গা, সে পাহাড় আর কিছুতেই খুঁজে পেলাম না। অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে নিজের পথে ভেসে যাব যেই, দেখি, ছোট একটা ডিঙ্গিতে কে-একজন প্রাণপণে বৈঠা চালিয়ে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন! নৌকোর খোল জলে ভরে গেছে। নৌকো ডুবল বলে! আমাদের দেখতে পেয়ে নৌকোর মানুষটিও প্রাণপণে হাত নেড়ে আমাদের নজরে পড়তে চাইছিলেন। বহু কষ্টে তাঁকে বোটে তুললাম। তিনিই এই গুরুজী। আমি আমার বোটের মুখ ঘুরিয়ে নিজের পথে যাবো যেই, গুরুজী বারণ করলেন। বললেন, 'নঙ্গর ফেলো, বোট এখানেই রাখো! দোহাই তোমার, এ জায়গা ছেড়ে যেওনা।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'এখানেই আশপাশে কোথাও সমুদ্রের নীচে তীর ঘেঁষে এক পাতালপুরীর ঠিকানা আছে, যার কথা কেউ জানে না।' ওর কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তারপর পাতালপুরীর ফটকের যে বিবরণ দিলেন, তাতে বুঝলাম, আমি যে সুরঙ্গ-মুখ দেখেছি, উনিও তারই কথা বলছেন।

ঝড়ে নঙ্গর ফেলতে পারিনি। তবে ঝড় খুব জোর ছিল না। দেখতে দেখতে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। দুজনে মিলে অনেক চেষ্টা করে আবার সেই তীরের পাহাড় খুঁজে বার করে জলে নামলাম। কোনো সন্দেহ নেই যে সমুদ্রের তলে এক বিশাল পুরীতে ঢোকার পথ আমরা খুঁজে পেয়েছি। গুরুজী নাকি এই পুরীর কথা বহুদিন থেকেই জানেন। সেদিন ওর ভেতরে অনেকটা ঢুকেওছিলেন।...এখন গুরুজীই বাকী কথা বলুন।'

আয়াজ থামল। আমি অবাক বিস্ময়ে চুপ করেই রইলাম। কারও মুখে কথা ছিল না। গুরুজী চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বললেন, 'সাধু-সন্ন্যাসী বলতে আপনারা সাধারণত যা বোঝেন, আমি মশাই তা নই। ভারতের লুপ্তপ্রায় ভাষা নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করি। না, কোনো ইউনিভারসিটি বা কোনো নামী প্রোফেসারের তত্ত্বাবধানে নয়। এ আমার শখের গবেষণা। দক্ষিণ ভারতের লুপ্ত ভাষা নিয়েই। দক্ষিণ ভারতের আদিমকালের কথা জানতে হলে রামায়ণ পড়তেই হবে। রামায়ণে যক্ষ রক্ষ দৈত্য দানব সুর ইত্যাদি বহু জাতির কথাই লেখা আছে। তাঁরা ছিলেন এক একটা ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ। ভিন্ন তাঁদের ভাষা, চালচলন, রীতিনীতি। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, তিনি পৃথিবীর বুকে প্রাণীপুঞ্জের সৃষ্টি করলেন। আর তাঁদের রক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করলেন অন্য আর এক নতুন প্রাণীপুঞ্জ। জন্মের কিছুকাল পরে সেই নতুন সৃষ্ট প্রাণীপুঞ্জ ভয়ে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে বললেন, 'আমরা এখন কি করবো?' প্রশ্ন শুনে ব্রহ্মা হেসে বললেন, 'হে জীবগণ, তোমরা পৃথিবীর বুকে আমার সৃষ্ট প্রাণীগুলির মধ্যে মানবগণকে রক্ষা করো। নতুন সৃষ্ট প্রাণীপুঞ্জের মধ্যে একদলের তেমন খিদে ছিল না, তাঁরা ব্রহ্মার কথা শুনে খুশি মনে বলল, 'রক্ষামঃ।' অর্থাৎ রক্ষা করবো। কিন্তু যাদের খিদেয় প্রাণ যাচ্ছিল, তাঁরা সমস্বরে বলল, 'যক্ষামঃ।' মানে খেয়ে ফেলবো। এই উত্তর শুনে ব্রহ্মা বললেন, 'তোমরা যারা বাপু রক্ষামঃ বলেছ, আজ থেকে রাক্ষস নামে পরিচিত হলে। আর যারা যক্ষামঃ বলেছ তারা হলে যক্ষ।' যক্ষামঃ মানে পালন করাও হয়। মানে যাই হোক, এই রাক্ষস-যক্ষদের অনেক কথাই রামায়ণে লেখা আছে। তাঁরা প্রযুক্তিবিদ্যা জানতেন, নগর বানিয়েছিলেন, শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতের কোনো সভ্য জাতি থেকে কোনো অংশেই কম ছিলেন না। এছাড়া রামায়ণে দৈত্য আর বানর সভ্যতার কথাও পাওয়া যায়। এদের সম্বন্ধে কবি-কল্পনায়

যা-ই ভাবা হোক্‌-না-কেন, এরাও ছিল উন্নত সভ্যতার মানবগোষ্ঠী। আমি এইসব লুপ্ত সভ্যতার মানবগোষ্ঠীর ভাষা নিয়েই গবেষণা আরম্ভ করলাম। রামায়ণে এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বর্ণনা আছে। মনে হয় আর্য সভ্যতার সঙ্গে রাক্ষস সভ্যতার যুদ্ধের কথাই লেখা। সে যুদ্ধে রাক্ষস সভ্যতা প্রায় ধ্বংসই হয়ে গিয়েছিল। সেইসঙ্গে ধ্বংস হয়েছিল দৈত্য দানব ইত্যাদি আরও কয়েকটা সভ্যতা। আর্য সভ্যতার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে অন্য আর সব কিছুই এমনভাবে ধ্বংস করেছিল, গ্রাস করেছিল, যে, বর্তমানে ভারতের বুকে রাক্ষস সভ্যতা, যক্ষ সভ্যতা, দানব সভ্যতা, দৈত্য সভ্যতা, এমন কি আর্যদের দাসত্ব করে বাঁচতে চেয়েছিল যে বানর সভ্যতা, তাও সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। কোথাও কোনোকিছুর এতটুকু চিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলাম। যাঁদের ভাষা নিয়ে চিন্তা করবো, তাঁদের কোনো চিহ্নই যদি কোথাও খুঁজে না পাই, তো এগোবো কি করে? মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ববিদরা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা কথা বলল বলে! কিন্তু আমার বেলায় তেমন কিছু কোথাও পেলাম না। গেরুয়া পরে দক্ষিণ ভারত ঘুরেছি। তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি অতীতের চিহ্ন। কোথাও কিছু পাইনি।

হঠাৎ রামায়ণের এক জায়গায় দেখলাম লেখা আছে, রাক্ষসরাজ সুমালী তাঁর কন্যা কৈকসীর বিয়ে দেবার জন্য পাতাল থেকে বার হয়ে আসেন। মাল্যবান, সুমালী, মালী এই তিন রাক্ষস ছিলেন লঙ্কার রাজা। তাঁদের অত্যাচারে দেবতারা বিষ্ণুকে অনুরোধ করেন এদের বধ করতে। বিষ্ণু রাজী হন, মালীকে বধ করেন। মাল্যবান আর সুমালী ভয় পেয়ে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে পাতালে পালান। পরে মেয়ের বিয়ে দিতে আবার উঠে আসেন।

আর এক জায়গায় লেখা আছে, রাবণরাজার বোন শূর্পনখার

বিয়ে হয়েছিল পাতাল নিবাসী দানব বংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্বর সঙ্গে। শুধু কি এই, সমুদ্র-মধ্যে ভোগবতীনগরীতে নিবাত কবচ দৈত্যেরা বাস করতেন। লঙ্কার রাজা রাবণ তাঁদের সঙ্গে এক বছর যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে কারও জয় না হওয়াতে শেষপর্যন্ত ব্রহ্মার পরামর্শে দুই পক্ষ অগ্নি সাক্ষী করে সন্ধি করেন। রাবণরাজা সমুদ্রপতি বরুণের রাজপ্রাসাদও পাতালে খুঁজেছিলেন। কারণ সে প্রাসাদ পাতালেই ছিল! তিনি সে প্রাসাদ খুঁজে বার করেন, আক্রমণ করেন, যুদ্ধে বরুণদেবের পুত্রেরা কাবু হন।

এইসব লেখা পড়ে মনে হয়েছিল, সে যুগে মানুষ সমুদ্রতলে নগর প্রাসাদ বানিয়ে বাস করতো। রাক্ষস বা দৈত্যরা বা যক্ষরাই এ ব্যাপারে এগিয়ে ছিল। আমাদের পুরাণ ইত্যাদিতে এ প্রমাণও পাওয়া যায়। রাক্ষস, দৈত্য বা যক্ষরা, এ যুগে যাকে এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা বলে, তাতে খুব দক্ষ ছিল। তবে কেন সাগরতলে বাস তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার হবে! দেশের মাটিতে যে সভ্যতার কোনো চিহ্নই আমি খুঁজে পাইনি, এখনও হয়তো তা সমুদ্রতলে কোথাও লুকোন আছে। পৃথিবীর বুকে দুই সভ্যতার সংঘাতে একে অন্যকে ধ্বংস করেছে, এমন নজির বহু আছে। সাগরতলে তেমন যুদ্ধের কথা রামায়ণে থাকলেও সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবার কথা লেখা নেই। সুতরাং ঠিক করলাম সমুদ্রতলেই খোঁজা শুরু করবো। কুম্ভক বিদ্যা শিখলাম। তারপর দম ধরে সাগরতলে এখানে ওখানে ডুব দিতে শুরু করলাম। আমার ক্ষমতা কম, অর্থ বলও কম। একটা শক্ত ছোট ডিঙ্গিই ভরসা। তাই সাগরের তীর ঘেঁষেই ডুব দিতাম। গত সাত বছর ধরে এ কাজ আমি করছি। বারবার বিফল হয়েছে আমার প্রচেষ্টা, আর তাতেই যেন রোখ আরও বেড়েছে। ক-মাস আগে সাগরতীরের এক বিশেষ জায়গায় একটা অদ্ভুত পাহাড়ের দেখা পেলাম। একটা বাহু ক্রমশঃ ঢালু হয়ে সাগরতলে চলে গেছে। কেমন যেন মনে হলো ঐ ডুবন্ত

পাহাড়টার আশপাশে খুঁজলে হয়তো অতীতের কোনো নিদর্শন পাওয়া যেতেও পারে, সাগরতলে যা আজও সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছে। প্রথম দু-দিন কিছুই পেলাম না। তৃতীয় দিনে ডুবো পাহাড়ের এক ধারটা দেখলাম হঠাৎ যেন ভেঙ্গে খাড়া নীচে নেমে গেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম ব্যাপারটা প্রাকৃতিক। পরে ভালো করে নজর করে দেখি পাহাড়ের ধার মানুষের হাতে কাটা! কিছুদূর নামতেই সুরঙ্গ-মুখটা পেলাম। প্রথমদিন ভেতরে ঢুকতে কেন যেন সাহস হলো না। পরে একদিন সাহস করে ঢুকলাম। সুরঙ্গটা উল্টো ইংরিজি 'ভি' অক্ষরের মতো, একটা মুখ তার জলের তলে হলেও ভেতরে সুরঙ্গের দেওয়ালে সুন্দর সিঁড়ি কাটা আছে, যা জল ভেদ করে ক্রমে ওপরে উঠে গেছে। পিছল সিঁড়ি বেয়ে আমি 'ভি' অক্ষরের শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত উঠেছি। সে জায়গা, সাগর-জলের সীমা-রেখার ওপরে। সেখানে অক্সিজেন আছে! কারণ সাহস করে মোমবাতি জ্বালিয়েছিলাম। কিন্তু অপরদিকে নেমে যাওয়া সিঁড়ি ধ্বস পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ওদিকে যেতে হলে, একজন পাহাড় চড়ার কলা-কৌশল জানা লোক চাই। বিশেষ করে এমন একজন চাই, যার গুহা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। তাছাড়া চাই সাজ-সরঞ্জাম। ওসব আমার সঙ্গে না থাকার জন্যই আমি ফিরেছিলাম। ফেরার পথে ঝড়ে পড়ি। দিকহারা হয়ে প্রায় অকুলেই ভেসে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আয়াজ আমাকে তাঁর বোটে তুলে নেয়। একটু সুস্থ হতেই আয়াজের কাছে শুনলাম, সেও ডুব দিয়ে ঐ পাতাল সুরঙ্গের মুখ দেখে এসেছে। ও-ই আমাকে আপনাদের কথা বলে। লোপেস সাহেব আর ডাক্তার কাইকোয়াড়ের ইচ্ছাতেই আজ আমরা এখানে মিলেছি। সবার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, চলুন, ঐ পাতাল সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকি। অতীতের বহু রহস্যই তাহলে সমাধান করতে পারবো আমরা।'

গুরুজী থামলেন।

অনেকক্ষণ আমরা কেউই কিছু বলতে পারলাম না। শেষে এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'আপনি কি জানেন যে, কেভ এক্সপ্লো-রেশন একটা বিশেষ ধরনের এ্যাডভেঞ্চার, পাহাড় চড়ার মতো এতেও বিশেষ কতোকগুলো কায়দা-কানুন শিখতেই হয়। তা না-জানলে অতল গুহার মধ্যে হয়তো ঢোকা যাবে, বার হয়ে আসা যাবে কিনা সন্দেহ। যদ্দুর জানি, আমাদের কারও তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই। সুতরাং কোন্ সাহসে আমরা এ কাজ হাতে নেবো?'

একটু ভেবে গুরুজী বললেন, 'এ-কথা যে আমি ভাবিনি তা নয়। গুহাটা খুঁজে পাবার পর থেকেই গুহা সম্বন্ধে বিদেশী যতো বই যোগাড় করতে পেরেছি, পড়েছি। চারদিকে খোঁজ নিয়ে যতদূর জেনেছি, কেভ এক্সপ্লোরেশনের অভিজ্ঞতা আছে এমন লোক এদেশে পাওয়া যাবে না। ভেবেছিলাম আপনাদের সাহস আছে। সমুদ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে। আপনারাই এগিয়ে আসবেন এদেশের প্রথম কেভ এক্সপ্লোরার হবার জন্য। অতীতের এমন সম্পদ হাতের কাছে পেয়েও আমরা তা দেখবো না, শুধু কতোকগুলো কায়দা-কানুন জানি না বলে, তা যেন ভাবতেই পারছি না। জানি এতে বিপদ আছে, প্রাণহানি হবার ভয়ও আছে। সে তো সব এ্যাডভেঞ্চারেই আছে। যুগ যুগ ধরে মানুষ পাহাড় চড়ছে, সে সম্বন্ধে কতো কায়দা-কানুন শিখেছে, তবুও প্রায় প্রতি বছরই পাহাড় চড়তে গিয়ে কেউ-না-কেউ প্রাণ হারাচ্ছেন। তা বলে তো অন্যরা পিছিয়ে নেই! কেতাবী অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হয়েছে। হাতে-কলমে তা কাজে লাগাতে সাহায্য করতে পারব। কিন্তু আমার চাই কিছু সাহসী সঙ্গী, যাঁরা প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে এগিয়ে আসবেন। আয়াজের কাছে আমি যেন তেমন মানুষের কথাই শুনেছিলাম। এখন দেখছি সে ধারণা ভুল!'

উনি থামতেই আয়াজ বলল, 'না গুরুজী, এ আপনার ভুল

কথা। অন্য কেউ আপনার সঙ্গে না-থাকলেও আমি আছি। আমার বোট আছে। কবে রওনা হবেন বলুন? ঐ সুরঙ্গটা আমাকে খুঁজে দেখতে হবেই। দেখতে হবে কি আছে ওর মধ্যে।'

গুরুজী বললেন, 'সাবাস ভাই। এমন লোকই আমি চাই।' বলে আর একবার আমাদের সবার মুখের দিকে তাকালেন।

লোপেস বলল, 'খুড়ো-মশাই, ডুবুরীর কাজ না জেনেও আমরা ডুবো সোনা তুলতে সাগরে গিয়েছিলাম। সোনাও তুলেছি। কারণ রয় সাহেব আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এখানেও গুরুজী সঙ্গে আছেন, বই পড়ে তিনি কেভ এক্সপ্লোরেশনের সব টেকনিকই শিখেছেন। তা এখন কাজে লাগাতে চান। ভেবে দেখুন খুড়ো-মশাই, সে কাজ এদেশে আমরা ছাড়া আর কে করতে পারে?···কেউ না। তবে তো না বলার কোনো উপায়ই নেই আমাদের। রামায়ণ আমি পড়িনি, জানিনা কি লেখা আছে তাতে। তবে দু-দুজন লোক সাগরতলে এমন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছে, যার কথা আমরা মিথ্যে বলে এড়িয়ে যেতে পারিনা। তাহলে সব মিলিয়ে কি দাঁড়াচ্ছে?'

ডাক্তার কাইকোয়াড় এতক্ষণ চুপ করে বসে কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, 'গুরুজী, বই পড়া জ্ঞান আপনারই এ বিষয়ে সব থেকে বেশি। কি কি জিনিসপত্র লাগবে তার ফর্দ করুন। টাকার হিসেব করুন। একটা দিন স্থির করুন যাত্রার।'

মহা উৎসাহে গুরুজী বললেন, 'কিন্তু এ্যাফোন্সো সাহেব তো এখনও হ্যাঁ বললেন না। শুনেছি, তিনিই আপনাদের দলপতি।'

এ্যাফোন্সো সাহেব হেসে বললেন, 'দলের সবার মতই দলপতির মত। তবে এ বিষয়ে মিস্টার রয়ের মতামত এখনও আমরা জানতে পারিনি।'

আমি বললাম, 'রামায়ণ মন দিয়ে পড়েছি। গুরুজীর কথায়

আমরা পুরোপুরি নির্ভর করতে পারি। কেভ এক্সপ্লোরেশনের অভিজ্ঞতা আমাদের নেই বটে, তবে সাবধানে এগোলে ভয়ের তেমন কিছু আছে বলে মনে করিনা। বিশেষত সে গুহা যদি এককালে সভ্য মানুষদের বাসস্থানই হয়ে থাকে। কিন্তু তবুও আর একটা প্রশ্ন আছে। তা হলো টাকা। এতো টাকা আসবে কোথা থেকে? কম জিনিসপত্র তো লাগবে না আমাদের!'

আমার কথা শুনে আবার সবাই চুপ করলেন। কি যেন ভেবে কাইকোয়াড় বললেন, 'আমি অর্ধেক খরচ বহন করবো। অতীতে ভারতবাসীরা যে সমুদ্রতলে বাসা বেঁধেছিল তা প্রমাণ করতে পারলে এও প্রমাণ হবে, বিদেশীদের সাগরতল সম্বন্ধে নানা কথা ভাবার আগেই এদেশে সে বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মানুষ সাগরতলে বাসা বেঁধেছিল।···এ ভ্রমণের অর্ধেক খরচ তাই আমি দেবো।'

লোপেস বলল, 'সাবাস ডাক্তার! বাকি অর্ধেক আমি দেবো। তবে খুড়ো, একটা শর্ত আছে। এ যাত্রায় আমাকে তিমি শিকারের সুযোগ দিতেই হবে!' বলে ঘর কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

আয়াজ বলল, 'আমি সাহেব আমার বোটটা দেবো। আব্বা আর চাচাকেও চিঠি দিয়েছি, তারাও এলো বলে। আর তাহলে আমাদের কি কি জিনিসের প্রয়োজন রইল?'

ভীষণ অভিভূত হয়ে গুরুজী বললেন, 'এতো তাড়াতাড়ি আপনারা যে এমন একটা গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, তা ভাবিনি। মাপ করবেন, কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সম্বন্ধে হয়তো বিরূপ ইঙ্গিত করেছি!'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'ওসব কথা থাক্, যাওয়া যখন ঠিকই হলো, তখন দেরি করা বৃথা। জিনিসপত্র কেনার ব্যবস্থা করা হোক্। যাত্রার দিনও ঠিক করে ফেলো।'

ঠিক হলো জিনিসের ফর্দ করবেন গুরুজী। কাইকোয়াড় আর লোপেস কেনাকাটার ভার নেবে।

আমি আর এ্যাফোন্সো সাহেব নানান ম্যাপ ঘেঁটে আয়াজের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলাম এবারেও আমাদের যাত্রা শুরু হবে চালিয়েম থেকে। পাওয়ার বোট নিয়ে বোম্বাই থেকে যাত্রা করে ভারতের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছাতেই আমাদের অর্ধেক রসদ আর তেল ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়া লোক জানাজানি হবার সম্ভাবনাও বেশি। তাতে ঝামেলা বাড়া ছাড়া আর কোনো লাভই হবে না।

আমাদের এই প্রোগ্রাম অনুযায়ী আলি রাজা আর কুট্টি আলিকে তার করে দেওয়া হলো। তাঁরা যেন সি. এম. ভি. ৩৭১কে নিয়ে ঠিক দিন ঠিক জায়গায় হাজির থাকে। এই ষ্টিমলঞ্চে করে আমরা এর আগেও অভিযান চালিয়েছি।

আয়াজ চলে গেল তার বোট নিয়ে আর এক, ক্ষেপ মাল পৌঁছাতে। সময়মতো সেও এসে মিলবে চালিয়েমের সাগরতীরে সি. এম. ভি. ৩৭১-এর সঙ্গে।

পরের বেশ কিছুদিন আমরা ভীষণ ব্যস্ত রইলাম জিনিসপত্র যোগাড় করতে। দেখতে দেখতে লোপেসের ঘরে মালের একটা পাহাড় জমে গেল। সারাদিন গুরুজী দোকানে দোকানে ঘুরে, রাতে বই নিয়ে বসতেন। আমরা সবাই তাঁকে ঘিরে বসে কেভ এক্সপ্লোরেশন সম্বন্ধে নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম।

বই পড়ে যা বুঝেছি, তাতে পাহাড় চড়ার উপযোগী সরঞ্জামের দরকার পড়বে বলেই মনে হয়েছে। তার ব্যবস্থাও করা হলো। দেওয়ালে গাঁথা পেরেক জাতীয় জিনিস। পেরেক আংটা, যার মধ্যে দিয়ে দড়ি গলিয়ে দেওয়া যায়। এছাড়াও হাল্কা ধাতুর তৈরি বেশ ক-খানা লম্বা মই, কিম্বা নাইলনের তৈরি শক্ত পাহাড় চড়ার দড়িও বেশ কিছুটা যোগাড় করা হলো।

শেষপর্যন্ত একদিন সকালে একগাদা মাল লরীতে বোঝাই করে আমরা রওনা দিলাম চালিয়েমের দিকে। ঠিক দিনেই, দিনের আলোতেই জালি বোটে মাল বোঝাই করে চালিয়েম ছাড়লাম। দূরে সমুদ্রের বুকে আমাদের পুরনো বন্ধু সি. এম. ভি. ৩৭১কে দেখে মন খুশিতে ভরে গেল। তার পাশেই আয়াজের ঝকঝকে নতুন বোট। শখ করে নাম রেখেছে 'খোজা বেগ'। সত্যি বলতে কি, খোজা বেগের সোনাতেই তো ও বোটটা কিনেছে।

আগে থেকেই আমরা ঠিক করেছিলাম সি. এম. ভি. ৩৭১-এ থাকবেন এ্যাফোন্সো সাহেব, আলি রাজা, কুট্টি আলি আর গুরুজী। কুট্টি আলির ছেলে জাফর আজকাল আয়াজের জায়গায় কাজ করছে, ঐ বোটে সেও থাকবে। দ্বিতীয় বোট 'খোজা বেগ'। তাতে থাকব আমি, কাইকোয়াড়, লোপেস, আয়াজ আর তার দুই সহকারী দীন মহম্মদ ও মনসুর। এ যাত্রায় পথ দেখিয়ে আগে আগে চলবে আয়াজ। পিছনে সি. এম. ভি. ৩৭১ আসবে। জলে নামব আমি, আয়াজ, গুরুজী, কাইকোয়াড় আর লোপেস। বাকিরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে দুটো বোটকে সামলাবে।

সুরঙ্গের শীর্ষবিন্দুতে আমরা দুই বোটের মালপত্র টেনে নিয়ে গিয়ে কোথাও রাখবো। সেটাই হবে আমাদের প্রথম কাজ। তারপর ধ্বসে পড়া নীচে নেমে যাওয়া সুরঙ্গের ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করবো। ভেতরে অন্ধকার হবে জানতাম। তাই হাল্কা ধরনের দুটো জেনারেটার সেট বানিয়ে নিয়েছি। দুটোই হাতল ঘুরিয়ে হাতে চালাতে হবে। এমনভাবে তৈরি যে পিঠে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এছাড়া টর্চ বা অন্যধরনের আলোর ব্যবস্থাও করেছি। সুরঙ্গের মধ্যে সম্ভবতঃ অন্ধকারই হবে আমাদের প্রধান বাধা!

[দুই]

সমুদ্রে প্রথমদিন নিরাপদেই কাটল। একটানা চলে ভোরবেলা এমন এক জায়গায় পৌঁছালাম যেখানে তীর ঘেঁষে ছোট-বড় পাহাড়ের শ্রেণী দেখা গেল। জল মেপে তীরের খুব কাছে বোট নিয়ে গেল আয়াজ। বোটের গতি কমিয়ে তীরের দিকে নজর রেখে এগোলাম আমরা। বেশ বুঝতে পারলাম ডুবো পাহাড়ের সঠিক জায়গা সম্বন্ধে আয়াজের মনে খুব সন্দেহ আছে। মাত্র একদিনই ও হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল সেখানে, ল্যাটিচুড লঙ্গিচুডের হিসেব কষে জায়গাটার নিশানা লিখে রাখেনি। পরে ঝড়ের মুখে পড়ে ওকে ভেসে যেতে হয়েছিল। আমি ওকে বললাম, 'দুটো বোট কাছাকাছি আনিয়ে গুরুজীকে আমাদের বোটে তুলে নাও। উনি হয়তো তাহলে ঠিক জায়গার নিশানা দিতে পারবেন।'

আয়াজ রাজী হলো। পর পর তিন বার হর্ন বাজিয়ে ও বোট থামিয়ে দিল। ওই ছিল আমাদের সংকেত। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, আমাদের নির্দেশ না মেনে সি. এম. ভি. ৩৭১ আমাদের পাশ দিয়ে পুরো দমে এগিয়ে গেল! আয়াজ আবার তিন বার হর্ন বাজিয়ে সংকেত দিল। সে সংকেত ৩৭১-এর কেউ শুনতে পেল বলে মনে হলো না!

খুব দূরে ছিল না ৩৭১। কিন্তু থামল না কেন! অবাক হয়ে আমরা ওদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লোপেস চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন আয়াজ, বোট চালু করো। ধাওয়া করো ৩৭১কে। কি যে হলো, বুঝতে পারছি না।'

খোজা বেগ আবার চলতে শুরু করল। কিছুটা এগোতেই হাওয়ায় ভেসে এলো ৩৭১-এর হর্নের আওয়াজ। স্পষ্ট সংকেত, ওরা আমাদের পিছনে আসতে নির্দেশ দিচ্ছে।

কাইকোয়াড় বললেন, 'গুরুজী বুঝতে পেরেছেন, আয়াজ নিশানা হারিয়ে ফেলেছে। তাই ৩৭১কে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাছাড়া ৩৭১-এর অমন করে এগিয়ে যাওয়ার আর অন্য কোনো মানে হতে পারে না।' অগত্যা ৩৭১কেই সামনে রেখে এগোলাম আমরা। সারাদিন কিছুই আর ঘটল না। ৩৭১ সমানে এগিয়ে চলল। তীরের পাহাড়ের চেহারা বদল হলো। ছোট ছোট টিলার জায়গায় একটানা পাহাড়শ্রেণী দেওয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে মনে হলো। বিকেল নাগাদ এমন একটা জায়গায় পৌছালাম, যেখানে পাহাড়ের পাশের বাহুগুলো নেমে গেছে জলে। ছোট-বড় এমন বেশ কতোকগুলো ডুবো পাহাড়ের বাহু আমরা পিছনে ফেলে আরও এগোলাম। এর মানে আমরা মালাবার উপকূলের ঠিক জায়গায় প্রায় এসে গেছি।

আয়াজ তখন হালের চাকার কথা প্রায় ভুলেই গেছে। ও স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তীরের দিকে। আমরাও নজর রাখলাম। একটা উঁচু পাহাড় যার একদিক ক্রমশঃ নীচু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রে, সেটাই আমাদের লক্ষ্য। সামনে সি. এম. ভি. ৩৭১-এরও থামার কোনো লক্ষণ দেখলাম না। যদিও গতি কমিয়েছে ওরা, তবুও ওদের বোটের মুখ সামনেই।

আয়াজকে বেশ চিন্তিত মনে হলো। হালে তখন কাইকোয়াড়। আয়াজ একটা দূরবীণ নিয়ে তীরের পাহাড়গুলোকে খুঁটিয়ে দেখছিল। চোখ থেকে দূরবীণ নামিয়ে বলল, 'ছোটসাহেব, পাহাড়টার দেখা তো পাচ্ছি না! হিসেব মতো যতোটা পথ আমরা এসেছি তাতে তো মনে হয় এরই আশপাশে কোথাও সে পাহাড়। কিন্তু নজরে পড়ছে কই?'

আমি বললাম, 'সি. এম. ভি. ৩৭১-ও তো থামছে না। গুরুজী তো ও পাহাড় অনেকবার দেখেছেন। তবে ভাবনার কি আছে, তিনি থামার নির্দেশ দিলেই থামবো আমরা।'

হালের কাছ থেকে কাইকোয়াড় বললেন, 'অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। অন্ধকারে এগোনো ভুল হবে। আমাদের উচিত এখন থামা। কাল ভোরে আবার খোঁজা শুরু করতে হবে।'

আয়াজ বলল, 'আমারও তাই মত। ভোঁ বাজিয়ে ৩৭১কে থামার হুকুম দেবো?'

হঠাৎ গলুইয়ের কাছ থেকে লোপেস চেঁচিয়ে উঠল, 'কাকে থামতে বলবে আয়াজ? সামনে তো ৩৭১ না-পাত্তা। যদ্দুর দেখা যাচ্ছে কোথাও তো তার চিহ্নমাত্র নেই! কি হলো ৩৭১-এর!'

আয়াজ ব্যস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে চোখে দূরবীণ লাগাল। পরক্ষণেই ওর মুখ থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বার হলো। দূরবীণ থেকে চোখ তুলে বলল, 'সর্বনাশ! ৩৭১ তো সত্যিই হারিয়ে গেছে!'

সবাই আমরা তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি, সামনে বেলা-শেষের আবছায়ায় যতদূর নজর যায়, ৩৭১ কোথাও নেই। কি হলো ৩৭১-এর? ডুবে গেল? কিন্তু তা কি করে সম্ভব! ঝড় নেই, সমুদ্র শান্ত, সি. এম. ভি. ৩৭১কে ক-দিন আগেই তো বোট সার্ভেয়ারকে দিয়ে সার্ভে করানো হয়েছে। যথেষ্ট মজবুত, সমুদ্র যাত্রায় উপযোগী বলেই তো সার্টিফিকেট পাওয়া গেছে। তবে? আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম।

মনসুর মাস্তুল বেয়ে ওপরে উঠেছিল। চেঁচিয়ে উঠল, 'হুঁসিয়ার, সামনেই ডুবো পাহাড়। জলের অনেক ভেতরে চলে এসেছে। বার সমুদ্রের দিকে বোটের মুখ ফেরাও, অনেক ঘুরে যেতে হবে আমাদের।'

ওর চিৎকারে হুঁস ফিরে পেল যেন আয়াজ। দূরবীণ লোপেসের হাতে দিয়ে ছুটে এসে হালের চাকা নিজের হাতে নিয়ে বলে উঠল,

'আরে কি আহাম্মোক আমি! সহজ কথাটাই এতক্ষণ বুঝতে পারিনি! আমরা আমাদের জায়গায় পৌঁছে গেছি। ৩৭১ তো ডুবো পাহাড়ের আড়ালে! দেখতে পাবো কি করে?'

হালের চাকা ঘুরিয়ে বোটের মুখ বার সমুদ্রের দিকে করে দিল। মাস্তুল থেকে মনসুর দিক্ নিশানা দিতে লাগল। সেইমতো এগিয়ে চলল্ খোজা বেগ। ডুবো পাহাড়ের প্রায় শেষ সীমায় যখন পৌঁছেছি, তখনি হঠাৎ দূরে তীরের কাছ থেকে ৩৭১-এর হর্ন শুনতে পেলাম। বার বার বাজছে। ভয় পেয়ে জানতে চাইছে আমরা কোথায়, কি হয়েছে আমাদের। আয়াজ দড়ি টেনে খোজা বেগে-র হর্ন একটানা কিছুক্ষণ বাজিয়ে দিল। মানে সব কিছু ঠিক আছে, আমরা আসছি।

দেখতে দেখতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বোটের আলোয় খুব সাবধানে এগোলো আয়াজ। পাহাড়ের আশপাশের জল মেপেই এগোতে হচ্ছিল। পুরো বেড় দিয়ে ডুবো পাহাড়টাকে পাশে ফেলতেই, দূরে তীরের কাছে আলো ঝলমল ৩৭১-এর দেখা পেলাম। অল্প জলে নঙ্গর ফেলেছে ৩৭১।

পাশাপাশি দুটো বোটকে নঙ্গর করে গেলাম ৩৭১-এ। গুরুজী আমাদের জন্যেই উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। বললেন, 'আসুন সাহেব, কাল জলে নামার প্রোগ্রামটা ঠিক করে ফেলি। দুটো দলে ভাগ করে আমরা জলে নামবো। প্রথম দলে আমি, লোপেস আর কাইকোয়াড়। দ্বিতীয় দলে আয়াজ, আপনি আর জাফর। শুনলাম জাফরও মোটামুটি স্কিন ডাইভিংয়ে রপ্ত হয়েছে।'

এ্যাফোন্সো সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রথমে কি আপনারা গুহাটা দেখেই আসবেন? নাকি কিছু মালপত্রও সঙ্গে নেবেন?'

আমি বললাম, 'প্রথম দলে যাঁরা নামবে, তাঁরা পারলে গুহার শীর্ষে একটা জায়গা ঠিক করে কিছু মাল রেখে আসবে। দ্বিতীয় দল তাঁদের নির্দেশ মতো বাকি জিনিসপত্র নিয়ে যাবে সঙ্গে।

মাল পৌঁছে, তাঁরা দেখবে ওদিকের সুরঙ্গের অবস্থা। তাঁরা ফিরলে আলোচনা করে পরের কাজ ঠিক করা হবে।'

কাইকোয়াড় বললেন, 'আমরা দু-জনেই কি শেষপর্যন্ত গুহার মধ্যে ঢুকবো?'

লোপেস বলল, 'দল ভারী থাকাই তো ভালো। ওদিকের পথে দড়ি ধরে যদি লোক নামতে হয় নীচে, তবে তো বেশী লোকই লাগবে।'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'বেশ, তাহলে আসুন। সবাই মিলে মালগুলোকে গুছিয়ে ফেলি।'

মালপত্র গুছিয়ে নিতে রাত অনেক হলো। দুটো জেনারেটর সেটই নীচে যাবে। সেই সঙ্গে পাহাড় চড়াইয়ের সব সরঞ্জাম, খাবারের প্যাকেট, কিছু ওষুধপত্র, দড়ির বাণ্ডিল, টর্চ। আসার আগেই ওগুলো সবই আমরা ওয়াটার-প্রুফ্ করে প্যাক করেছি। নীচে শুকনো জায়গায় পৌঁছে প্যাক খুলে নেবো।

কাজের মাঝে লোপেস হঠাৎ বলল, 'আচ্ছা মিস্টার রয়, নীচে কি আমাদের কিছু অস্ত্র নিয়ে যাওয়া উচিত হবে?···নিলে কি ধরনের অস্ত্র সঙ্গে নেবো?'

কাইকোয়াড় বললেন, 'নীচে ঘোর অন্ধকারে কি কোনো প্রাণী বাঁচতে পারে? জলে সামুদ্রিক জীব ছাড়া সুরঙ্গের মধ্যে আর কিসের ভয়?'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'শুনেছি, সমুদ্রে অতিকায় সব সাপ আছে। তেমন যদি দু-একটা বাসা বেঁধে থাকে সুরঙ্গে, তাহলে কি হবে?'

আমি বললাম, 'অতীতে পাল-টানা জাহাজের আমলে নাবিকরা সাগরে অতিকায় সরীসৃপ দেখেছে বলে রটাতো। ইদানিংকালে তেমন কথা আর শোনা যায়নি। মনে হয়, অতিকায় সাপের কথাটা ভয় আর চোখের ভুল থেকে গড়া গল্প!'

আমাদের কথা মন দিয়েই শুনছিলেন গুরুজী। বললেন, 'আমি তিন বার ঢুকেছি গুহার মধ্যে। সঙ্গে আলোর ব্যবস্থা তেমন ছিল না। প্রথমবার ভয়ে বেশী দূর এগোতে পারিনি। বাকি দু-বারই শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছিলাম। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মোমবাতি দু-বারই জ্বেলেছিলাম সেখানে। সেই অল্প আলোতে সুরঙ্গটার অন্ধকার পুরো কাটেনি। তবে যদ্দুর দেখতে পেয়েছি, সাপ বা অন্য কোনো প্রাণীর সাড়া পাইনি।'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'শীর্ষবিন্দু থেকে নীচের দিকে যখন নামবেন, সেদিকে তো কিছু থাকতে পারে। খালি হাতে যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না।'

লোপেস বলল, 'প্রথমে যাঁরা যাবেন, তাঁরা এ বিষয়ে একটু খেয়াল রাখবেন। প্রথম মালের সঙ্গে আমি আমার বন্দুক নিয়ে নীচে যাব। প্রয়োজনে তা ব্যবহার করবো।'

একথা শুনে ভীষণ চিন্তায় পড়লেন গুরুজী। খানিক ভেবে নিয়ে বললেন, 'লোপেস, নীচে গুলি ছোঁড়ার ফল ভালো না-ও হতে পারে। হয়তো শব্দের কাঁপুনিতে কোনো-মতে লেগে-থাকা কোনো পাথরের চাঁই জায়গা ছাড়া হয়ে খসে পড়তে পারে। তার ফলে সুরঙ্গের একটা দিক ধ্বসেও যেতে পারে। বন্দুক নিয়ে যাবে ভালো কথা, কিন্তু গুলি চালাবার আগে হাজার বার ভাববে।'

লোপেস বলল, 'কী সর্বনাশ! অতিকায় সাপ তাড়া করে গিলতে আসবে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি চারদিকের দেওয়ালের পাথর দেখবো, কোন্‌টা আলগা কোন্‌টা শক্ত। দেখে গুলি চালাবার আগেই তো খতম হবো!'

'সাপ নেই, এ আমার স্থির বিশ্বাস।' বললেন গুরুজী, 'একটা কথা কেন ভাবছো না, ঘোর অন্ধকারে যে-সব প্রাণী বাস করে তাদের দেখার উপায় থাকে না। তাই তাদের চোখও নেই।

তারা একদম অন্ধ। সাপ থাকলেও সে তাড়া করে আসবে না। মরতে হলে তার ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হবে আগে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে লোপেস বলল, 'যাক্, বাঁচলাম তাহলে। তবুও বন্দুকটা নিয়েই যাব। কিছু না-হয় তো ফেরার পথে সাগরে একটা··· ।'

ওর কথায় বাধা দিয়ে কাইকোয়াড় বললেন, 'এমনও তো হতে পারে, ওদিকের সুরঙ্গে কোথাও কোনো বড় ফাটল আছে, যে ফাটল সোজা উঠেছে ওপরের মাটি ভেদ করে। সেখান দিয়ে আলো বাতাস সবই ঢুকছে সুরঙ্গে। বাতাস যে চলাচল করছে ভেতরে তার প্রমাণ তো আপনি পেয়েছেন। সে-পথেই আলোও ঢোকে সুরঙ্গে। তাহলে সাপ জাতীয় প্রাণী থাকাও অসম্ভব নয়।'

এই কথা আমাদের সবাইকে আবার ভাবিয়ে তুলল।

গুরুজী কেবল নিশ্চিন্ত রইলেন। একটু ভেবে বললেন, 'অনেক ক্ষেত্রে এমন ঘটতে পারে। তবে আমরা যে সুরঙ্গে ঢুকবো তার সঙ্গে ঐ জলের তলের পথ ছাড়া অন্য কোনোভাবেই পৃথিবীর ওপরের আর যোগাযোগ নেই বলে মনে হয়। মনে রাখবেন, রাবণ রাজা ত্রিভুবন জয় করেছিলেন। একসময়ে সমুদ্রে নেমে পাতাল জয় করবার চেষ্টা করেছিলেন। ঐ সুরঙ্গ যে সভ্য মানুষদের বাসস্থান ছিল তাতেও সন্দেহ নেই। হয়তো এদের সঙ্গেই রাবণ রাজার যুদ্ধ হয়েছিল জলের তলায়। অন্য কোনো ভাবে ঐ সুরঙ্গে ঢোকার উপায় থাকলে, কে আর জলের তলে যুদ্ধ করতো বলুন?'

আমরা সবাই চুপ করে রইলাম। সবাইকে একবার দেখে নিয়ে গুরুজী বলে চললেন, 'রামায়ণ-মহাভারতের মতে প্রায় তিন কোটি নিবাত কবচ অসুর বাস করতো সমুদ্রের তলে দুর্গ বানিয়ে। সমুদ্র-তলে যাঁরা বাসা বানাবে, দুর্গ বানাবে, তাঁরা কেন পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের পথ রাখবে বলুন তো? সে পথে তো সহজেই শত্রু আক্রমণ করবে তাহলে! অবিশ্যি রামায়ণ যুগের অনেক পরে

মহাভারতের সময়ে পাণ্ডু-পুত্র অর্জুন ভীষণ যুদ্ধে এদের ধ্বংস করেন।...সে কথা থাক্। আমি মনে করি মাটির তলে একটা বিশাল সুরঙ্গের খবর আমরা পাবো। সেখানে আলো নেই। তবে বাতাস চলাচল করে, কিন্তু কি করে তা জানি না। সেই বাতাসের পথ দিয়ে দু-চারটে ছোটখাটো প্রাণী বা সরীসৃপ ভেতরে ঢুকতে পারে, বড় কোনো প্রাণীই সেখানে নেই। থাকলেও তারা অন্ধ।'

কাইকোয়াড় বললেন, 'তাই যদি হবে তবে নিবাত কবচ অসুররা কি করে ঐ ভীষণ অন্ধকারে বাস করতো? তাঁরাও কি অন্ধ ছিল?'

'না, তা হবে কেন?' বললেন গুরুজী, 'তাঁরা আমাদের মতোনই মানুষ ছিলেন। আগেই তো বলেছি, রাক্ষস, যক্ষ, অসুর, দৈত্য, দানবদের মধ্যে অনেক বড় বড় এঞ্জিনিয়ার জন্মেছিলেন। তাঁরা যে কতো-কি অসাধ্য-সাধন করেছিলেন তার ভূরি-ভূরি প্রমাণ রামায়ণ-মহাভারতে আছে। সুরঙ্গের মধ্যে যন্ত্র বসিয়ে আলো জ্বালিয়েছিলেন, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা করেছিলেন। আজকাল বৈজ্ঞানিকরা যে-সব ব্যবস্থা করে সাগরতলে বাসা বাঁধছেন, তাঁরাও সে যুগে তা-ই করেছিলেন!'

লোপেস আর থাকতে-না-পেরে বলল, 'গুরুজী, আপনি তো দেখছি ক্রমে ক্রমে এমন সব কথা শোনাচ্ছেন, যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলেও, কখনও সত্যি বলে প্রমাণ করা যাবে না। ঐ পাতাল সুরঙ্গের মধ্যে ঢুকেও আমরা প্রমাণ করতে পারবো না!'

ওর কথায় ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গুরুজী বললেন, 'এ্যাটমিক যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে পৃথিবীতে। তার ভয়ঙ্কর ধ্বংসের কথা আজ আর কার না-জানা। রামায়ণ-মহাভারতে এমন সব অস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা প্রায় ঐরকমই। তাই-বা বলি কি করে, নিউট্রন বম্ যা ক-দিন আগে আমেরিকা ফাটিয়েছে, তেমন সীমিত ধ্বংস-ক্ষমতা-সম্পন্ন অস্ত্রের কথাও লেখা আছে। আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে

যুদ্ধ হতো সে যুগে। অগ্নিবাণ, বরুণ বাণ, ঐ সব তো সামান্য কথা ছিল। এসব যে যুগে ঘটতো, সে যুগের একদল মানুষ যদি তাঁদের বুদ্ধি দিয়ে সমুদ্র জয় করে পাতালে বাসা বানায়, তো না বলার কি আছে তাতে।···আর মাত্র ক-ঘণ্টা, তার পরই সব রহস্যের সমাধান হবে।'

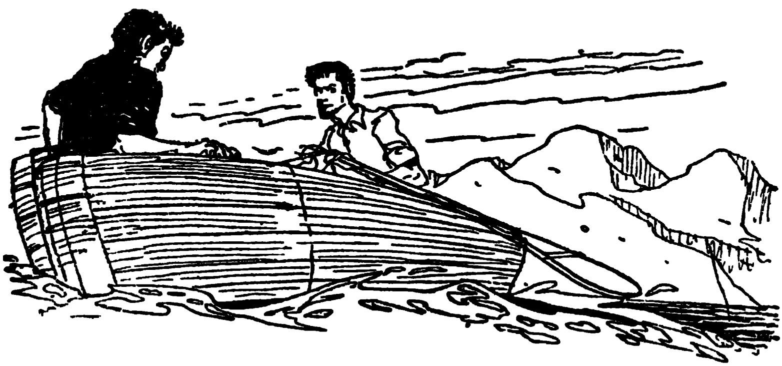
রাতে আমরা সবাই ৩৭১-এ রয়ে গেলাম। আয়াজের হাতের রান্না খেয়ে যে যেখানে পারলাম, শুয়ে পড়লাম। আবহাওয়া বেশ ভালো। এমন যদি কালও থাকে, তো জলে নামা কোনো সমস্যাই হবে না। শোয়ার আগে আমি আর লোপেস এ্যাকোয়া লাংগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলাম। এবারে প্রত্যেকটা গ্যাস সিলিণ্ডার দেখে আনা হয়েছে, মাঝ-পথে গ্যাস কম হবার ভয় আর নেই। হার্পুন গানগুলোও সব ঠিক আছে। তীরের এতো কাছে হাঙরের ততো ভয় নেই বলেই মনে হয়। রাতে গুরুজী ভীষণ নাক ডাকিয়ে আরামে ঘুমোলেন। আমাদের কারও ততো ভালো ঘুম হলো না। লোপেস তো মাঝে দু-বার উঠে এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করে এলো। কাইকোয়াড় এপাশ ওপাশ করে কাটালেন। আয়াজ বা জাফরও কিন্তু বেশ নিশ্চিন্তেই আরামে রাত কাটাল। নানান চিন্তার মধ্যে ভোররাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। রোদ ওঠার পর আমাকে ডেকে তুলে দিলেন এ্যাফোন্সো সাহেব। উঠেই দেখি ওদিকে জলে নামার জন্য প্রথম দলের সবাই তৈরি!

প্রথমেই বোটের পাশ দিয়ে দড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো জলে। ওটাতে টান দিয়ে সংকেত দেবে নীচের লোকেরা। মালের একটা বোঝা ক্রেনে লাগিয়ে আমি আর জাফর সেটাকে নামিয়ে দিলাম জলে। নীচের থেকে নির্দেশ পেলে ক্রেন ঘুরিয়ে গুহা মুখ বরাবর করে দেবো বোঝাটা।

জালি বোটে উঠল দীন মহম্মদ আর মনসুর। ঐ বোট

সারাক্ষণ জলে ভাসবে। গ্যাস সিলিণ্ডারের বুদ বুদ লক্ষ্য রাখবে। কেউ ভেসে উঠলে তাকে নৌকোয় তুলবে।

এ্যাকোয়া লাং পরে গুরুজী সবার আগে তৈরি! উনি যৌগিক প্রক্রিয়ায় দম বন্ধ করে নামার কথাই বলেছিলেন। আমরা তাতে রাজি না হওয়াতে, এ্যাকোয়া লাং পরলেন। জিনিসটা কি করে ব্যবহার করতে হয় তা অবিশ্যি ভালো করেই শিখে নিয়েছিলেন। কাইকোয়াড় আগেই এ্যাকোয়া লাং ব্যবহার করেছেন। সমুদ্রতলে



কাজও করেছেন ওটা পরে। লোপেসও ওর ব্যবহার জানে। তবে এই প্রথম সমুদ্রের গভীরে ডুব দেবে। এক এক করে ওরা তৈরি হয়ে নিলো। এ্যাফোন্সো সাহেব ডেকের ওপরেই ওদের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন। সিঁড়ি বেয়ে জলে নেমে ওরা এক এক করে ডুব দিল। সঙ্গে-সঙ্গেই খোজা বেগের খালি বোটটায় আমি আর আয়াজ চড়ে বসলাম। ক্রেনের দায়িত্ব নিলেন এ্যাফোন্সো সাহেব।

ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে জলে ভেসে ওঠা বুদবুদের দিকে নজর রাখতে লাগলাম। ছায়ার মতো ওরা তিন জন জলের তলে মিলিয়ে গেলেন। অল্প স্রোত, কোথাও হাঙ্গর বা বড় জাতের কোনো মাছ ছিল না। ছোট ছোট ঢেউয়ের বুকে থেকে-থেকে বুদবুদগুলোই

ভেসে উঠছিল। ওরা ক্রমে নেমে যাচ্ছে। আমাদের কারও মুখে কোনোই কথা ছিল না। বুদবুদগুলো ক্রমে আরও তীরের দিকে সরে যাচ্ছিল। নৌকো আমরা সে-দিকেই নিয়ে যাচ্ছিলাম! হঠাৎ এক জায়গায় স্থির হয়ে গেল বুদবুদগুলো। তারপর ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে থেকে। দুটো নৌকোর দাঁড় টেনে আমরা পাগলের মতো এপাশে ওপাশে বুদবুদ খুঁজতে লাগলাম। জলে এমন কিছু ঢেউ নেই যে তার জন্য বোঝা যাচ্ছে না! তবে কি হলো ওদের?

ভয় পেয়ে আয়াজ বলল, 'এ্যাকোয়া লাংগুলো জলের তলে খারাপ হয়ে গেল? নাকি গ্যাস সিলিণ্ডার সব খালি ছিল? গ্যাসের চাপ মাপার যে মিটারটা এনেছি ওটা খারাপ!'

আমি বললাম, 'কি জানি! কিছুই তো বুঝতে পারছি না! এমন তো হবার কথা নয়!'

আমার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আয়াজ তার এ্যাকোয়া লাংটা পরে ফেলল। হাতের ইসারায় আমাকে নৌকো সামলাতে বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। স্পষ্ট দেখতে পেলাম পায়ের পাখনার ধাক্কায় ও সাঁ-সাঁ করে নেমে যাচ্ছে গভীর জলে!

[তিন]

তখনি আমার মনে পড়ল, ভয়ের কিছুই নেই। ওরা তিন জন গুহার মধ্যে ঢুকেছেন। তাই বুদবুদ আর এদিকে উঠছে না। মিছিমিছি আয়াজকে হয়রানি করা হলো। জলের তলায় গিয়ে ওদের দেখতে না-পেয়ে মাথা ঠিক না রাখতে পারলে বিপদ হবে। দীন মহম্মদকে ওদের নৌকো কাছে আনতে বললাম।

ওরা এসেই বলল, 'সাহেব, নীচে কি কিছু গোলমাল হয়েছে? বুদবুদ দেখতে পাচ্ছি না। আয়াজও তলে চলে গেল, এমন তো কথা ছিল না!'

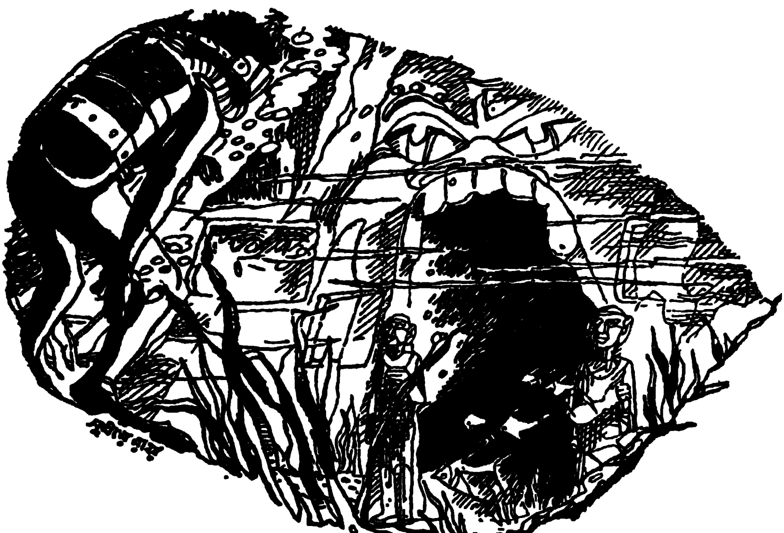
ব্যাপারটা যে কি, ওদের বুঝিয়ে বললাম। তারপর আমার নৌকোটাকেও সামলাতে বলে এ্যাকোয়া লাং পড়ে জলে ঝাঁপ দিলাম। আয়াজকে ফিরিয়ে আনতে হবে এখুনি। নয়তো একলা বিপদে পড়তে পারে।

পাহাড়ের কোন্ ঘেঁষে নীচ বরাবর নেমে চললাম। আশপাশ ভালো করে দেখার মতো মনের অবস্থা ছিল না। কেবল লক্ষ্য ছিল কোন্‌খানে ডুবো পাহাড়ের ঢাল খাড়া নেমে গেছে নীচে, সেইখান দিয়েই সোজা নীচে নামলে সুরঙ্গের মুখ।

একটু এদিক ওদিক দেখতেই খাড়া দেওয়াল খুঁজে পেলাম। কোনো সন্দেহ নেই পাহাড়ের এই দেওয়াল মানুষের হাতেই কাটা! সাঁ-সাঁ করে বেশ কিছুটা নেমেই আয়াজকে দেখতে পেলাম। যা ভেবেছি তাই! ঘাবড়ে গিয়ে এদিক ওদিক ভেসে যাচ্ছে। ও ছাড়া আর কোথাও কেউ নেই। আমি যে জলে ঝাঁপ দিয়েছি, শব্দ শুনে আয়াজ তা বুঝেছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে স্থির হলো। ওর কাছে পৌঁছে হাত নেড়ে ইঙ্গিতে ওপরে

উঠতে বললাম। অনেক করে বোঝালাম ভয়ের কিছুই নেই। কি বুঝল জানি না। হাত নেড়ে সামনের দিকে কি যেন দেখাল। সেদিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হলো না! যা দেখছি, তা কি সত্যি! নাকি জলের তলের চাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে!

সামনে দেওয়ালের অনেকটা জুড়ে কালো অন্ধকার। এক বিশাল খিলান কাটা দরজায় বিরাট মুখ হাঁ করে রয়েছে। বিকট এক



কল্পিত সামুদ্রিক প্রাণীর মুখ। কী অপূর্ব খোদাই কাজ! ফটকের দুই পাশে হাতে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়ান দুটো দ্বারপালের মূর্তি। তাদের মুখও অতি বিকট করে গড়া। এ ছাড়াও খাড়া দেওয়ালের গা ভর্তি খোদাই করা বড় বড় চৌকোনা সব প্যানেল।

আয়াজকে ইসারায় এগোতে বলে আমি দেওয়ালের খোদাইয়ের কাছে এগিয়ে গেলাম। আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম, সারা দেওয়াল জুড়ে যুদ্ধের দৃশ্য খোদাই করা! এ নিশ্চয়ই রাবণ রাজার সঙ্গে যুদ্ধের দৃশ্য। আরও কাছে গিয়ে দেখি, কী আশ্চর্য,

ছবির প্যানেলগুলো কারা যেন অস্ত্রের আঘাতে বিশ্রী ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছে! এ কি তবে পাণ্ডুর পুত্র অর্জুনের কাজ! নিবাত কবচ সভ্যতা তো তিনিই ধ্বংস করেছিলেন!

আয়াজকে ওপরে উঠতে বলে আমি আস্তে আস্তে ভেসে উঠলাম। জলের ওপরে মাথা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই আয়াজও ভেসে উঠল পাশে। দীন মহম্মদ আমাদের কাছে নৌকো নিয়ে এলো। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিক আছে তো সাহেব?'

তাকিয়ে দেখি ৩৭১-এর রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আলি রাজা, কুটি আলি আর এ্যাফোন্সো সাহেব। ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন ওরা। কিছু একটা বিপদ ঘটেছে এই ওদের ধারণা। হাত নেড়ে ওদের নিশ্চিন্ত করে নৌকোয় উঠলাম আমি আর আয়াজ। দীন মহম্মদ আর মনসুরকে নৌকোয় রেখে আমরা ৩৭১-এ ফিরলাম। আমাদের বিশ্রাম দরকার। গুরুজীর দল ফিরলেই আমাদের ডুব দিতে হবে।

৩৭১-এর সবাই আমাদের ঘিরে ধরল। জাফর জিজ্ঞেস করল, 'সাহেব, নীচে কি সমুদ্র-দানোর ভয় আছে নাকি?'

আমি বললাম, 'না, না, কোনো ভয় নেই নীচে। তুমি নিশ্চিন্তে আমাদের সঙ্গে ডুব দিতে পারো।'

'সাগরে ডুব দিতে ভালোই লাগে সাহেব। তবে বড় ভয় করে হাঙ্গর মগরের। নইলে আর কিছুতেই···।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে এ্যাফোন্সো সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি মিস্টার রয়, আপনি আর আয়াজ দু-জনেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যে! নীচে কিছু গোলমাল হয়েছে নাকি?'

কি হয়েছিল বুঝিয়ে বললাম। তিনজনেই গুহার মধ্যে ঢুকে গেছে! এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

নিশ্চিন্ত মনে বসে থাকা হলো না। সবাই ছট্‌ফট্ করতে লাগল। সংকেত দড়ির কাছে বসে এ্যাফোন্সো সাহেবই বেশী ব্যস্ত

হয়ে পড়লেন। দুর্ভাবনা তাঁরই বেশী। থেকে থেকে আমাকে নানান বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন। যে-সব প্রশ্নের অধিকাংশের উত্তর আমার জানা নেই।

দু-ঘণ্টা কেটে গেল। তবুও নীচ থেকে কোনো সাড়া পেলাম না। এ্যাফোন্সো সাহেব আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কি আর-একবার নীচে গিয়ে দেখবেন?'

আমিও কম চিন্তায় পড়িনি। গুরুজীর কাছে যদ্দুর শুনেছি তাতে গুহা মুখের উল্টো 'ভি' বাহুর এদিকের দৈর্ঘ্য খুব বেশী হলে হাজার মিটার খাড়াই হবে। আটশো মিটারের মতো জলের তলে, বাকিটায় বাতাস আছে। বাকি দু-শো মিটার সিঁড়ি দিয়ে উঠে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে ফিরে আসতে কেন এতো সময় লাগছে?

এ্যাফোন্সো সাহেবকে বললাম, 'আরও কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করে আমরা নীচে নামবো।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই সংকেত দড়িতে গোটা চারেক পরপর টান পড়ল। ক্রেনের দড়িও ঢিলে হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার মানে ওদিকে কেউ মালের বোঝা খুলে নিলেন। বাকি মালের বোঝাও নামাতে নির্দেশ দিচ্ছেন ওরা।

মহা খুশি হয়ে এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'তবে তো ওরা ভালোই আছে! গুহার শীর্ষবিন্দুতে মাল নাবাবার মতো জায়গাও খুঁজে পেয়েছে। যাক্‌, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

দ্বিতীয় মালের বোঝাটা আমরা তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিলাম নীচে। দড়ি পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন মিটারের মতো ঢিলে দিতেই সংকেত দড়িতে একটা জোর টান পড়ল। আমরা ক্রেন থামালাম। তার মানে গুহা-মুখ প্রায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন মিটারের মতো জলের তলে।

দ্বিতীয় বোঝাটাও খুলে নিল নীচের কেউ। সংকেত দড়িতে কিন্তু আর টান পড়ল না। কথা ছিল মোট তিনটে প্যাকেট নামিয়ে দেওয়া হবে এবারে। তবে কি তিন জনের একজন

গুহার শীর্ষবিন্দুতে রয়ে গিয়েছেন। বাকি দু-জন ফিরে এসেছিল মালের বোঝা টেনে নিয়ে যেতে! এ্যাফোন্সো সাহেবও তেমনি সন্দেহ করলেন।

অধীর আগ্রহে আবার আমরা বসে রইলাম সংকেত দড়িতে টান পড়ার আশায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে দড়িতে আবার টান পড়ল। মালের বোঝা আগেই নামিয়ে রেখেছিলাম। ক্রেনের দড়ি আল্‌গা হতেই মাল কেউ খুলে নিলো। ক্রেনের দড়ি টেনে তুলে দেখলাম তাতে একখণ্ড দড়ি বাঁধা রয়েছে। তার মানে ঠিক ভাবেই সব কিছু হয়েছে! বেলা একটার পরে আমি আর



আয়াজ আবার নৌকো ভাসালাম। এর কিছুক্ষণ পরেই জলে বুদবুদ উঠতে লাগল। এক এক করে ওরা তিনজন ভেসে উঠলেন।

মুখোস খুলে ফেলে লোপেস বলল, 'মিস্টার রয়, ধারণা করতে পারবেন না, কি দেখে এলাম নীচে! গুরুজী ঠিকই বলেছেন, জলের নীচে বিরাট এক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। বলতে গেলে কিছুই তার দেখিনি। তবু যা দেখেছি তাতেই বলতে পারি, সত্যি, অবিশ্বাস্য কাণ্ড! পৃথিবীকে একটা নতুন কিছু শোনাতে পারবো আমরা!'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'নীচে কোনো বিপদ ঘটেনি তো?'

'না, না, কোনো বিপদ নেই নীচে।' বলল লোপেস, 'এক ভয় ধরানো বিশ্রী অন্ধকার ছাড়া, দানব বা সরীসৃপ, কিছুর দেখা পাইনি আমরা।'

গুরুজী বললেন, 'অন্ধকারে আমি একা শীর্ষবিন্দুতে অনেকক্ষণ ছিলাম। মাঝে মাঝে আলো জ্বেলেছি বটে, তবে অন্ধকারে বসে থেকে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টাও করেছি। মনে নানা চিন্তা এলেও, অন্য কোনো কিছুর সাড়া পাইনি। নীচে শীর্ষবিন্দু নিরাপদ জায়গা।'

কাইকোয়াড় বললেন, 'শেষ বার মাল নিতে আমি একা আসা যাওয়া করেছি। মনে অস্বস্তি ছিল, কিন্তু পথে কোনো কিছুই ঘটেনি। মনে হয়, গুহা পথে যাওয়া-আসা করা নিরাপদ। অবিশ্যি সমুদ্রে হাঙরের মুখে যদি না-পড়ি!'

৩৭১-এর পাটাতনে একটা ছোট সভা বসল। আয়াজ সবার খাবার এগিয়ে দিল। খেতে খেতে আমরা নীচের বিবরণ শুনলাম! তিন জনেই একসঙ্গে সুরঙ্গে ঢুকেছিল। জলের মশাল জ্বালা ছিল। সুরঙ্গের দেওয়ালে নানান খোদাই করা মূর্তি আর নক্সায় ভরা। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। ধাপের পাশে মাঝে মাঝে এক দিকে বড় চাটান। সিঁড়ি শীর্ষবিন্দুতে বড় একটা চাটানে গিয়ে শেষ হয়েছে। সমুদ্রের জল জোয়ার-ভাঁটার টানে সুরঙ্গের মধ্যে প্রায় কুড়ি মিটারের মতো ওঠা নামা করে। শীর্ষবিন্দু তারও অনেক ওপরে। সেখান থেকেই সুরঙ্গের অন্য দিকে সিঁড়ির পাশে পাশে চাটান আছে। ওদিকেও সারা দেওয়াল খোদাই করা। ভেতরে ওরা মোমবাতি জ্বালিয়ে দেখেছিল হাওয়া আছে কিনা। আলোর শিখা উজ্জ্বল থাকাতেই এক এক করে মুখোস খুলে ফেলেছিল। কোনো কষ্ট হয়নি। ওদিকের সিঁড়ি দুটো চাটান পর্যন্ত ভালোই আছে। তারপরই ধ্বস নেমে মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। তবে

ধ্বসে-পড়া পাথরগুলোর মাঝে অনেক ফাঁক আছে। তা দিয়ে গলে আরও নীচে নামা সম্ভব বলেই মনে হয়।

ওদের বক্তব্য শেষ হতেই এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'কিন্তু ঐ সব ভয়ঙ্কর ফাঁক গলে নীচে নেমে যাওয়া হয়তো সোজা হবে, ফিরে আসা যাবে কি?'

এ সন্দেহ আমাদের সবার মনেই জেগেছিল। তাই কোনো উত্তর না দিয়ে আমরা একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগলাম।

গুরুজী বললেন, 'জনা-ছয়েক একসঙ্গে নীচে যাবো আমরা। সঙ্গে থাকবে পাহাড় চড়াইয়ের সব সরঞ্জাম। একটা বড় ফাঁক দিয়ে দড়ি বেঁধে আপনারা আমাকে নীচে নামিয়ে দেবেন। আমি সঙ্গে আলো নিয়ে যাবো। কিছুটা নামলেই বোঝা যাবে ভেতরের অবস্থা। ফাঁক গলে ওদিকে নেমে সুরঙ্গের দেওয়ালে পাহাড় চড়াইয়ের বড় পেরেক পুঁতে নামার সময়েই আমরা একটা দড়ির সিঁড়ি মতো বানিয়ে রাখবো। মনে হয়, তা ধরে আবার ওপরে উঠে আসা তেমন শক্ত কাজ হবে না।'

কথাটা এ্যাফোন্সো সাহেবের খুব মনঃপুত হলো না। তিনি কিছু বলার আগেই গুরুজী আবার বললেন, 'ছ-জনেই নীচে নামবে না। নীচে যারা নামবে, তাদের সাহায্য কবার জন্য ক-জনকে ওপরে থাকতে হবে। প্রয়োজনে দড়ি ফেলে নীচের লোকদের টেনে তুলতে পারবে তারা। প্রথমে আমি একাই নীচে যাব।'

লোপেস বাধা দিয়ে বলল, 'সে কি গুরুজী, আমি তো কখনও বলিনি যে আমি নীচে নামবো না। তাছাড়া এমন সুযোগ পাওয়ার পর ঐ সুরঙ্গের শেষ না দেখে…।'

আয়াজ বলল, 'গুরুজী, আমিও আপনার সঙ্গে আছি।'

কাইকোয়াড় এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। বললেন, 'মনে হয় মিস্টার রয়ও আমার সঙ্গে আপনার পিছন পিছন সুরঙ্গে নামবেন।'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'ছয় জনের পাঁচ জনই যদি নীচে নেমে যায়, তবে শীর্ষবিন্দুতে যে থাকবে, একা সে তো পাঁচজনকে সাহায্য করতে পারবে না।'

নানা আলোচনার পর ঠিক হলো, নামার সময় নীচে গিয়ে দীন মহম্মদ আর মনসুরও জাফরের সঙ্গে থাকবে। আমরা নেমে যাওয়ার পর ওরা তিনজনই চলে আসবে ওপরে। জাফর শুধু দিনে একবার নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে খবর নেবে আমাদের। তিন দিন এমন করে চলবে। চতুর্থ দিনে ওরা তিনজনই গিয়ে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। প্রথম যাত্রায় আমরা তারমধ্যেই ফিরবো। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আমাদের এ-কথায় জাফর, দীন মহম্মদ আর মনসুর রাজি হয়ে গেল। একটু বিশ্রাম নিয়ে আমি, আয়াজ আর জাফর এ্যাকোয়া লাং পরে জলে নামার জন্য তৈরি হলাম। হাতে সময় বেশী নেই। মাল পৌঁছেই চলে আসতে হবে আমাদের! পথের খবর তাই ভালো করে জেনে নিলাম। আমাদের সাহায্য করবে বলে এবারে জলে নৌকো ভাসাল লোপেস আর কাইকোয়াড়। দীন মহম্মদ আর মনসুরও অন্য নৌকোটায় চাপলো।

এক এক করে ডুব দিলাম আমরা। জল বেশ পরিষ্কার। আয়াজ আর আমার মাঝখানে জাফরকে নিয়ে আমরা নেমে চললাম। দেখে মনে হলো না জাফর খুব ভয় পেয়েছে। আমাদের পাশ দিয়ে মালের বোঝাটা দিব্যি নেমে এলো। ক্রমে গুহা-মুখের কাছে পৌঁছে গেলাম। অন্ধকার গুহা-মুখ ভয়-দেখানো ভয়ঙ্কর হয়ে সামনে হাঁ করে রয়েছে, যেন আমাদের গিলে খাবে। বুঝতে পারলাম না জাফরের মনে ঐ অন্ধকার গুহা-মুখ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল কিনা। আয়াজ মালটা খুলে পিঠে তুলে নিল। দড়িতে টান দিয়ে সংকেত জানাল। কিছু পরেই দ্বিতীয় বোঝাটাও নেমে এলো নীচে। সেটা আমি নিলাম। তৃতীয় মালটা জাফর পিঠে

তুলে নিতেই আয়াজ তার হাতের জল মশালটা জ্বালিয়ে দিলো। চারদিকের জল সে-আলোয় ঝলমল করে উঠল। যে-সব মাছ আমাদের চারপাশে এতক্ষণ খেলা করছিল, ভয় পেয়ে মুহূর্তে পাখনা নেড়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

আয়াজ ভেসে চলল গুহা মুখের দিকে। আমি জাফরকে এগোতে নির্দেশ দিয়ে পিছনে রইলাম। জল খুব শান্ত। স্রোত প্রায় নেই বললেই চলে। অল্প চেস্টাতেই গুহা-মুখের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বিশাল গুহা, চারদ্দিকের দেওয়াল এখানে অনেক দূরে। আমাদের নীচে একটা বড় জাতের মাছ অন্ধকারে লুকিয়েছিল। হঠাৎ পাখনা নেড়ে আমাদের ভীষণ ভয় পাইয়ে পালিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে আয়াজ আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠতে লাগল। আমরাও ভেসে চললাম পিছন পিছন। একটু উঠতেই গুহার বেড় ছোট হয়ে এলো। চারদিকের দেওয়ালগুলো কাছে এগিয়ে এলো। এক পাশে সিঁড়ির দেখা পেলাম। সে সিড়িতে পা রাখতে গিয়ে আয়াজ পিছলে গেল। সে-চেষ্টা ছেড়ে শেষপর্যন্ত ভেসেই উঠতে লাগল। চারদিকের দেওয়ালে অপূর্ব কারুকায! মাঝে মাঝে বিশাল সব মূর্তি। চেনা-জানা কোনো মূর্তি নয় সেগুলো।

একসময়ে জলের ওপরে ভেসে উঠলাম। এখান থেকে সিঁড়ি বেয়েই ডঠতে হবে। মুখোস না-খুলেই সাবধানে প্রথম চাটানটাতে ডঠে পড়লাম। কোমর থেকে মোমবাতি আর দেশলাইয়ের প্যাকেট বার করে সাবধানে আলো জ্বালালাম। পট্ পট্ করে আওয়াজ তুলে মোমবাতির শিখা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এ্যাকোয়া লাং খুলে ফেললাম। আয়াজের হাতের মশাল আগেই নিভে গেছিল।

কাঁপা গলায় জাফর বলল, 'সাহেব, এ কোথায় এলাম? এ তো দেখছি সব মানুষের হাতে গড়া কাজ!'

আমি বললাম, 'এখানেই তোমাকে বার বার আসতে হবে জাফর। সে সাহস কি তোমার আছে?'

একটু ইতস্তত করে বলল, 'প্রথম প্রথম ভয় হবে সাহেব! তবে আমি পারবো। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন।'

আয়াজ বলল, 'সাবাস ভাই, সাবাস! এই তো চাই। এমন একটা লুকোনো রাজপুরীর খবর নিয়ে গেলে আমাদের কতো নাম হবে, তা ভেবেছ কি!'

একটু বিশ্রাম নিয়ে, সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। মোমবাতি নেভার অনেক আগেই টর্চ বার করেছিলাম। গভীর অন্ধকারের মধ্যে সে আলো যেন কিছুই না! অন্ধকারের থেকেও চারদিকের ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতাই যেন বেশি ভয়াল বলে মনে হতে লাগল। আমাদের পায়ের আওয়াজও যেন নিস্তব্ধতার মধ্যে ভয়-জাগানো শব্দ!

একটু উঠে আয়াজ বলল, 'এতো অন্ধকার! এমন ভয়ঙ্কর জায়গায় মানুষ থাকতো কি করে!'

আমি হেসে বললাম, 'মানুষ যখন ছিল, তখন তাঁরা যন্ত্র চালিয়ে আলো জ্বালতো। তাঁদের যন্ত্রের আওয়াজ শোনা যেতো।'

জাফর বলল, 'খেতো কি তাঁরা?'

আমি বললাম, 'হয়তো সমুদ্র থেকেই খাবার যোগাড় করতো। শাক-সব্জী-মাছ···।'

'শাক-সব্জী?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জাফর।

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, সমুদ্রে তো অনেক আগাছা জন্মায়। কে জানে তার কোন্‌টা খাওয়া যায়!'

দু-তিনটে চাটান পার হয়ে আমরা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছালাম এক পাশে আমাদের দলের রেখে যাওয়া মালপত্রগুলো রয়েছে দেখলাম। তার পাশেই মাল নামালাম। জায়গাটা বেশ লম্বা-চওড়া এক সাথে বেশ ক-জনই আরামে থাকতে পারে। আলো নিভিে

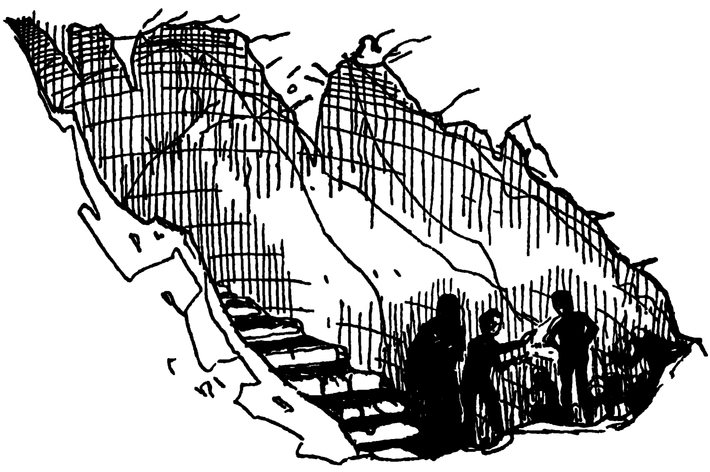
দিতেই যেন অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম। ভীষণ ভয়ে বুক কেঁপে উঠল!

চাপা গলায় জাফর বলল, 'আলো নিভে গেল কেন সাহেব? টর্চ কি খারাপ হয়ে গেল!'

আমি উত্তর দিলাম, 'না, এই অন্ধকারের সঙ্গে একটু-একটু করে আমাদের ভাব জমাতে হবে। নইলে বার বার এখানে আসবো কেমন করে! কেমন করেই-বা গুহার ভেতরে ঢুকবো!'

আয়াজ বলল, 'বাপ্‌রে! এ তো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমাদের আলো জ্বালবার কলগুলো কি আনা হয়েছে এখানে?'

জাফর বলল, 'হ্যাঁ, ওগুলো তো গুরুজীরা নিয়ে এসেছেন।



টর্চ আর ব্যাটারীও অনেক এসেছে সঙ্গে। কিন্তু তা দিয়ে কি এতো অন্ধকার দূর করা যাবে!'

আমি আবার আলো জ্বাললাম। আয়াজ বলল, 'চলুন সাহেব, ওদিকে সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নেমে দেখে আসি।'

আলো ঘুরিয়ে ওদিকে যেই ফেলতে যাব, জাফর চেঁচিয়ে উঠল,

'সাহেব, দেওয়ালে কি যেন লেখা আছে। আমি স্পষ্ট দেখেছি। একটা তারিখ বোধহয়।'

চমকে উঠে বললাম, 'তারিখ? কে লিখবে এখানে?'

আয়াজ বলল, 'এ নিশ্চয়ই গুরুজীর কাজ। আজকের তারিখ লিখে রেখেছেন দেওয়ালে।'

জাফর বলল, 'না সাহেব, ইংরিজি বেয়াল্লিশ সাল লেখা আছে যেন দেখলাম!'

আয়াজ ধমকে বলল, 'পাগল হলে তুমি! এটা সাতাত্তর সাল, গুরুজী বেয়াল্লিশ লিখতে যাবেন কেন?'

কাঁপা হাতে আলো ফেললাম জাফর যেদিকে দেখাল সেদিকে। একটা ছোট্ট মূর্তির সামনেই দেওয়ালে একেবারে স্পষ্ট দেখলাম লেখা রয়েছে: ১৮-৮-৪২।

'ঐ দেখুন সাহেব, ঐ দেখুন।' চেচিয়ে উঠল জাফর, 'আরও কি-সব লেখা রয়েছে দেখুন ওখানে।'

[চার]

আমি প্রায় কাঁপতে কাঁপতেই এগিয়ে গেলাম সামনে। দেওয়ালে পাথর ঘষে কে যেন ইংরিজিতে লিখে রেখেছেন: 'নীচে নামছি আজ। ১৮-৭-৪২।' নীচু হয়ে দেখলাম তলায় নাম লেখা, 'আপ্পালা রাজু!'

হাত কেঁপে গেল। চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। ঠিক দেখছি তো। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে আপ্পালা রাজু এই সুরঙ্গের পথ বেয়ে একা নীচে নেমেছিলেন। গেলেন কোথায় আপ্পালা রাজু। পৃথিবীকে তো এই সুরঙ্গপুরীর কথা তিনি শোনান নি। আয়াজ জিজ্ঞেস করল, 'কি লেখা আছে সাহেব?'

লেখাটা পড়ে ওদের শুনিয়ে দিলাম। আযাজ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'সর্বনাশ, আপ্পালা রাজু তাহলে সুরঙ্গ থেকে আর বার হতে পারেন নি। এতো দিনে কি আর বেঁচে আছেন। নির্ঘাত মারা গেছেন।'

জাফর বলল, 'সিঁড়ির ওদিকে কোথাও কি আর-কিছু লেখা আছে? চলুন দেখি গিয়ে। লেখা থাকলে বুঝতে পারবো কি হয়েছিল আপ্পালা রাজুর।'

সাবধানে আলো ফেলে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামতে লাগলাম। ওদিকের দেওয়ালে চমৎকার সব কারুকায। ভালো করে আলো ফেলে দেখতে লাগলাম আমরা। কোথাও আর কিছু লেখা নেই। সামনে তিনটে চাটানের শেষে ধ্বস পড়ে গুহা-মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে।

'আপ্পলা রাজু কোন্‌খান দিয়ে নীচে নেমেছিলেন?' জিজ্ঞেস

করল আয়াজ, 'ভালো করে আলো ফেলুন তো পাথরের মাঝের ফাটলগুলোতে। ওরই কোনো একটা গলে নিশ্চয়ই নেমেছিলেন।'

ভালো করে ফাটলগুলো আমরা দেখতে লাগলাম। একটু দূরের একটা ফাটলে আলো ফেলতেই আয়াজ আমার হাত ধরে ফেলল। একটু ভালো করে দেখতেই মনে হলো ফাটলের পাশের একটা চোখা পাথরের গায়ে কি যেন জড়ানো রয়েছে। কোমর থেকে ছুরি খুলে সাবধানে এগিয়ে গেল আয়াজ। সামনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জিনিসটা দেখেই বলল, 'দড়ি সাহেব, দড়ি।' ছুরি দিয়ে দড়িটা কেটে তুলে নিল। অতি সাধারণ কাছি দড়ি। এতো দিনে নষ্ট হয়ে গিয়েছে! ফাটলটার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। আপ্পালা রাজু নীচে নেমেছিলেন তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি আর কখনোই ওপরে উঠে আসতে পারেননি।

জাফর বলল, 'চলুন সাহেব, ফিরে যাই আমরা। অনেক দেরি হয়ে গেছে! আর দেরি করলে ওদিকেও অন্ধকার হয়ে যাবে।'

হুঁস ফিরতে হাতঘড়িতে দেখি হিসেবের থেকেও অনেক বেশি সময় নিয়ে ফেলেছি। আর দেরি করলে সত্যি-সত্যিই বিপদ হবে। দড়িটাকে ভালো করে প্যাক করে কোমরে ঝুলিয়ে নিলো আয়াজ। জলে ডুব দিয়ে মশাল জ্বেলে, বার হয়ে এলাম আমরা বার সমুদ্রে। সারা পথ আপ্পালা রাজুর কথাই মনকে ভারী করে রাখল। আশ্চয, এমন অপূর্ব একটা প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শন আবিষ্কার করেও তিনি তাঁর কথা কাউকে শোনাতে পারলেন না। প্রাণ দিলেন বেঘোরে!

আমাদের দেরিতে এ্যাফোন্সো সাহেব ভীষণ ব্যস্ত হয়েছিলেন। আমরা ৩৭১-এর পাটাতনে উঠতেই জিজ্ঞেস করলেন, 'এতো দেরি হলো যে! কোনো বিপদ ঘটেনি তো?'

আমরা ভালো আছি শুনে বললেন, 'থাক্, পরম দয়ালু যীশুর কৃপায় একটা দিন নিরাপদেই কাটল। আশা করি আমাদের এই এ্যাডভেঞ্চারও ভালোয় ভালোয় শেষ হবে।'

আয়াজ দড়ির টুকরোটা পাটাতনে রাখল।

গুরুজী জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কোথেকে আনলে ?'

'নীচ থেকে।'

'কে নিয়ে গিয়েছিল ?'

'আপ্পালা রাজু। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে।'

চমকে উঠলেন যেন গুরুজী। ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'কি বললে তুমি, আয়াজ··· ?'

'আপ্পালা রাজু। উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে তিনি ঐ গুহায় ঢুকেছিলেন। বার হয়ে আসতে পারেন নি।' বলল আয়াজ।

এই কথা শুনেই দু-হাতে মুখ লুকিয়ে মাথা নীচু করলেন গুরুজী।

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'তোমার এই হেঁয়ালী তো বুঝতে পারলাম না আযাজ। আপ্পালা রাজু কে ? কি হয়েছে তাঁর ?'

সব কথা খুলে বললাম আমরা। শুনে ডেকের সবাই যেন কেমন থম্‌কে গেল। কেউ আর কিছুই বলতে পারলেন না।

মুখ থেকে হাত সরিয়ে ভীষণ ভারী গলায় গুরুজী বললেন, 'এই আপ্পালা রাজুকে আমি চিনতাম।···হাতের বাজুতে তাঁর মস্তো একটা তাবিজ বাঁধা ছিল। এক গুরুর কাছেই আমরা দুজনে রামায়ণ-মহাভারত পড়ি। আমি পড়েছিলাম অবিশ্যি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। আপ্পালা রাজুর পড়া শখ করে। শেষকালে ওরই মাথায় প্রথমে সাগরতলের সভ্যতার কথা আসে। আমাকেও বলেছিল, চল, খুঁজে দেখি তীরের আশ-পাশে কোথাও কোনো নিদর্শন পাই কিনা। আমি রাজী না-হওয়াতে ও চলে যায় কোথায় যেন। পরে লুপ্ত সভ্যতার নিদর্শন যে কেবল সাগরতলেই পাওয়া যাবে তা যখন

বুঝতে পারি, তখন অনেক খুঁজেও আর ওর পাত্তা পাইনি।··
হায় বেচারা!'

পরের দিনও দু-দলে ভাগ হয়ে মাল নিয়ে গেলাম গুহার শীর্ষবিন্দুতে। দু-বারই তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আপ্পালা রাজুর আর কোনো চিহ্নই পেলাম না।

তৃতীয় দিনে মাল টানা শেষ হলো। রসদ যা সঙ্গে আছে তা যদি নীচে নামাতে পারি, তো অনায়াসেই ছয়-সাতদিন কাটাতে পারবো। তবে নীচে এবারে থাকবো মাত্র চার দিন। সুতরাং সে-দিক থেকে কোনো ভয় নেই।

আপ্পালা রাজু দড়ি বাছাই করতে ভুল করেছিলেন। আমরা সব থেকে মজবুত পাহাড় চড়াইয়ের দড়ি সঙ্গে নিয়েছি। আপ্পালা রাজুর সঙ্গে আর কি রসদ ছিল জানি না। আমরা হাল্কা এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বেশ ক-খানা মইও সঙ্গে নিয়ে চলেছি। একটার সঙ্গে আরেকটা যোগ করা যায়। আপ্পালা রাজু আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন কি? আমরা দুটো হাল্কা জেনারেটর নিয়ে যাচ্ছি, সঙ্গে লম্বা তার। একবার ব্যাটারী চাজ করে অনেকক্ষণ আলো জ্বালাতে পারবো। সে আলো তারের সঙ্গে ফাটলের মধ্যে দিয়ে নামিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাবো। আপ্পালা রাজু ফিরে আসতে পারেন নি, আমরা নিশ্চয়ই ফিরে আসবো।

রাত্রিবেলা এ্যাফোন্সো সাহেব চুপি চুপি আমার কাছে এসে বললেন, 'একটা খুব গোপন কথা ছিল মিস্টার রয়, যদি কাউকে না বলেন তো বলি।'

কেমন কুণ্ঠিত মনে হলো ওকে। অবাক হয়ে বললাম, 'বেশ তো, বলুন-না কি বলবেন?'

'নিজেকে আমার বড় ছোট মনে হচ্ছে। সবাই আপনারা ব্যস্ত। আমি কিন্তু কিছুই করছি না। যদি মত দেন তো গুহার শীর্ষবিন্দুতে চারদিন আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতে চাই।

জাফর বড়ই ছেলেমানুষ, ওর ওপরে ভরসা করা চলে না। ওরা সবাই না-হয় পালা করে আমাকে সঙ্গ দেবে।'

আমি ঝুঁকে পড়ে ওর হাত দুটো ধরে বললাম, 'এ্যাফোন্সো সাহেব, একথা আপনি না-বললে, কিছুক্ষণ পরে আমিই আপনাকে বলতাম। আপনার এই সাহায্য ছাড়া, এ কাজে নামা অসম্ভব! শীষবিন্দুতে সারাক্ষণ কাউকে-না-কাউকে থাকতেই হবে। কাল আপনিও যাবেন আমাদের সঙ্গে। তাহলে নির্ভয়ে আমরা নামতে পারবো নীচে।'

কথাটা গোপন রাখতে বললেন এ্যাফোন্সো সাহেব। হয়তো সবাইকে চমকে দেবেন বলে।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে-সঙ্গেই যাত্রার আয়োজন শুরু হলো। ব্রেকফাস্ট করেই নীচে নেমে যাবো আমরা সবাই। তারপর ভাগ্যে যা আছে, তা-ই ঘটবে।

গুরুজী আজ যেন ছেলেমানুষ হয়ে পড়েছেন। ভীষণ চটপটে। ভীষণ খুশি। বার বার আপ্পালা রাজুর নাম করে কপালে হাত ঠেকাচ্ছেন। বলছেন, 'এই গুহা-সভ্যতার কথা তুমিই প্রথম জেনেছো। পৃথিবীর সবার কাছে তোমার নাম করবো আমরা।'

এ্যাফোন্সো সাহেবের প্রার্থনার পর যাত্রা শুরু হলো। গুরুজী আর আয়াজের পিছন পিছন এক-এক করে জলে ডুব দিল কাইকোয়াড, লোপেস আর জাফর।

ওরা চলে যেতেই আমি এ্যাফোন্সো সাহেবকে বললাম চট্‌পট্‌ তৈরি হয়ে নিতে। ওকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবো দীন মহম্মদ আর মনসুরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। এ্যাফোন্সো সাহেবকে এ্যাকোয়া লাং পরতে দেখে আলি রাজা বলে উঠল, 'দু-দুটো বোট কি আমি আর কুট্টি আলি সামলাতে পারবো।...দীন মহম্মদ আর মনসুরকে রেখে যান এখানে, নইলে কিন্তু বোট ভেসে যাবে সমুদ্রে।'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'তাই তো, এ কথা তো আমরা কেউই চিন্তা করিনি। তাহলে কি হবে!'

আমি বললাম, 'থাক্ ওরা দু-জনে এখানেই। জাফরকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকেই তাহলে দিন-চারেক অন্ধকারে কাটাতে হবে। আমরা একসঙ্গে যাবো, এক সঙ্গেই ফিরবো।'

'সেই ভালো।' বললেন এ্যাফোন্সো সাহেব, 'সত্যি বলতে কি, আপনাদের একলা ছেড়ে দিতে কেমন যেন মন চাইছিল না। আলি রাজা, দিন-রাত তোমরা বোটের চারপাশে নজর রাখবে। আমরা ভেসে উঠি কিনা খেয়াল রাখবে। নঙ্গরের দড়ি



বা সংকেত দড়ি তুলবে না। মনে রেখো, ওগুলোই আমাদের ফেরার পথের নিশানা।'

আলি রাজা বলল, 'সাবধানে সব কাজ করবেন আপনারা। ভীষণ চিন্তায় থাকবো। আরও গোটাকতোক রঙ্গিন দড়ি নামিয়ে দিচ্ছি নীচে। আপনারা পথ হারাবেন না।'

দীন মহম্মদ আর মনসুর নৌকো ভাসাল। আমরা দু-জনে ডুব দিলাম জলে। ভেবেছিলাম অনভিজ্ঞ এ্যাফোন্সো সাহেব অসুবিধায় পড়বেন। ভয় পাবেন। কিন্তু অসম্ভব মনের জোরে নিজেকে সামলে নিয়ে আমার পাশে পাশে নেমে চললেন। তবে গুহামুখের

সামনে একটু থমকে দাঁড়ালেন। খানিকটা আনমনা হয়ে কী যেন ভাবলেন। একটু ইতস্তত করলেন। শেষপর্যন্ত আমি জল-মশালটা জ্বালাতেই মনের সব চিন্তা দূর করে আমার পিছন পিছন গুহার মধ্যে ঢুকলেন।

আলোয় সিঁড়িগুলো বা তার পাশে দেওয়ালের কারুকার্য আর মূর্তিগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতেই থমকে গেলেন এ্যাফোন্সো সাহেব। বোধহয় এমন অপূর্ব অবিশ্বাস্য কিছু যে তিনি দেখবেন, তা-যেন ভাবতেই পারেননি। জল থেকে ভেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই জল-মশালটা নিভে গেল। ওকে অন্ধকারে একা জলে রেখেই আমি উঠে পড়লাম চাটানে। মুখোশ খুলে তাড়াতাড়ি টর্চ বার করে জ্বাললাম। হাত বাড়িয়ে এ্যাফোন্সো সাহেবকে প্রায় জল থেকে টেনেই তুললাম। সাড়া পেয়ে ওদিকের ওরা সবাই নেমে এলো। এ্যাফোন্সো সাহেবকে দেখে সবাই অবাক! একটু পরেই শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছালাম। তখুনি কাজ শুরু হয়ে গেল। কাইকোয়াড় তার টেনে আলো নিয়ে গেলেন নীচের ধ্বস পর্যন্ত। যে-সব মাল আমাদের সঙ্গে নীচে যাবে, তাও টেনে নিয়ে ধ্বসের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে রাখা হলো। এসব কাজ শেষ হতেই ঘড়ির হিসেব মত বিকেল হয়ে গেল।

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'এসো, চাটানে বসে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে কালকের প্রোগ্রাম ঠিক করি।' আলো নেভাতেই আমরা যেন একে অন্যের কাছ থেকে হারিয়ে গেলাম। কেমন যেন অস্বস্তিতে মন ভরে গেল।

অন্ধকারেই গুরুজী বললেন, 'যে ফাটল দিয়ে আপ্পালা রাজু নীচে নেমেছিল, সেই ফাটল দিয়েই গলে আমি নীচে নামবো প্রথমে। ওপরে আপনারা আমার দড়ি ধরে রাখবেন। আমি নামবো ধাপে ধাপে। প্রথম ধাপে নেমে সংকেত দেবো, আপনারা পাহাড় চড়াইয়ের সরঞ্জামগুলো নামিয়ে দেবেন নীচে। দ্বিতীয় সংকেতে

দ্বিতীয়জন নামবে নীচে। দুজনে মিলে সেখানে যা ঠিক করবো সেইমতো চলবেন আপনারা।···আমার পর কে নামবেন সেটা ঠিক করুন।'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'দ্বিতীয়জন হলেন মিস্টার রয়। নীচে নেমে অনেক কিছু ভাবতে হবে। তাঁদের ভাবনা চিন্তার ওপরেই গোটা দলের ভাগ্য নির্ভর করছে। একাজে গুরুজীকে এক মিস্টার রয় ছাড়া আর কেউই তেমন সাহায্য করতে পারবে না।'

লোপেস হতাশ হয়ে বলল, 'ও খুড়ো, তুমি দেখছি আমাদের একেবারে মানুষ বলেই ভাবো না! হায় হায়! শেষপর্যন্ত তোমার কাছে এই শুনতে হলো··· !'

আয়াজ বলল, 'তারপর আমি নামবো বড় সাহেব। আমি!'

গুরুজী বললেন, 'বলেইছি-তো, বাকি সবকিছুই নির্ভর করবে নীচে আমরা কি দেখি তার ওপরে। যদি দেওয়ালে পেরেক ঠুকতে হয়, দড়ি লাগাতে হয়, মই খাটাতে হয়, তবে আয়াজ তোমাকেই নামতে হবে আগে। এখানে তোমার মতো শক্তিশালী কে আছে আর!'

লোপেস বলল, 'তাহলে দ্বিতীয় জেনারেটর সেটটাকে ফাটলের মুখের কাছে এখনই বসিয়ে দিই। লম্বা তারের মাথায় গোটাকতোক আলো ঝুলিয়ে দিই নীচের দিকে। আপনাদের নীচে নামতে তাহলে আর তেমন অসুবিধা হবে না।'

এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'তাই করো তাহলে।···ঐ সেটটা তো নীচেই যাবে শেষপর্যন্ত। কাজ না-হয় খানিককটা এগিয়ে রাখো।'

আলো জ্বলে উঠল আবার।

জাফর বলল, 'আমরা যেন কোথায় চলে গিয়েছিলাম! আবার ফিরে এলাম!'

ওর কথা শুনে সবাই হেসে উঠলাম।

কাইকোয়াড়, লোপেস আর আয়াজ জেনারেটরটা নীচে নিয়ে গেল। জাফর গেল রাতের রান্নার আয়োজনে। একপাশে পাথরের একটা তাকে ইলেকট্রিক স্টোভটা বসানো হয়েছে। ওখানেই রান্না হবে। নীচেও আমরা স্টোভ নিয়ে যাবো। অবিশ্যি অনেকটাই নির্ভর করতে হবে টিনের খাবারে!

গুরুজী বসে থাকার লোক নন মোটেই। মালপত্র বেছে বেছে তিনি নীচে নিয়ে যেতে লাগলেন। সে-কাজে আমরাও তাঁকে অনেক সাহায্য করলাম। তার খাটানোর কাজ শেষ করে খানিক বাদেই ফিরে এলেন কাইকোয়াড় আর লোপেস। শান্ত হয়ে বসলাম আমরা আবার। একটু পরে কাইকোয়াড় বললেন, 'একটা জিনিস নিশ্চয়ই খেয়াল করেছেন মিস্টার রয়, এতো পরিশ্রম করছি আমরা এখানে, তবুও এতটুকু হাঁপ ধরছে না! এখানকার বাতাস, পৃথিবীর ওপরের বাতাসের মতোই স্বাভাবিক। কিন্তু বাতাস আসছে কোথা থেকে?'

গুরুজী বললেন, 'গুহা সম্বন্ধে যতো বই পড়েছি, তাতে কিন্তু কোথাও বাতাসহীন গুহার কথা পড়িনি। ভূত্বক নানা জিনিসে গড়া, চুনাপাথরও আছে প্রচুর। চুনাপাথর সহজেই জলে গলে যায়। ওপরে বৃষ্টি বা নদীর জলে চুনাপাথর ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে। বড় ফাটল ধরলে হাওয়া চলাচল করে। ভূত্বকের বড় বড় নদী বিশাল চুনাপাথরের স্তর গলিয়ে অনেক সময় পাতাল সুরঙ্গের নদী হয়ে যায়। যে-পথে নদী ঢোকে পাতালে সে-পথে হাওয়া চলাচল করা অসম্ভব নয়' মোট কথা, ওপরের ভূত্বকের নানান ছিদ্র দিয়েই স্বাভাবিক বাতাস গুহার মধ্যে ঢোকে।'

লোপেস জিজ্ঞেস করল, 'নীচে কি তাহলে আমরা নদী পাবো?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' বললেন গুরুজী, 'এ কথা জোর দিয়ে বলতে

পারি। কারণ এ গুহায় মানুষের বাস ছিল। মিষ্টি জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না, এ তো সহজ কথা!'

'নদীতে মাছ আছে?' জিজ্ঞেস করলেন কাইকোয়াড়।

'থাকতেই পারে।' বললেন গুরুজী, 'তবে সে-সব মাছ কাঁচের মতো স্বচ্ছ আর তাদের চোখ বলতে কিছুই নেই! তবুও তারা অন্ধকারে বাঁচে, জন্মায় এবং বড় হয়! অন্ধকারে দেখার প্রশ্ন নেই, তাই চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। আলো নেই, তাই শরীরও যেন স্বচ্ছ! তবে সে-সব মাছ, আর অন্য অন্য বিষয়ে সাধারণ মাছের মতোই।'

জাফর বলল, 'রান্না হয়ে গেছে, আলো নিভিয়ে দিন! অন্ধকারে থাকা অভ্যেস করতে হবে আমাদের। আমাকে আর বড় সাহেবকে!'

তখনি এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'আয়াজ কোথায়, আয়াজ? তাকে তো দেখছি না!'

আমরা সবাই তাকিয়ে দেখলাম আমাদের মধ্যে আয়াজ নেই। লোপেস বলল, 'ও তো আমাদের সঙ্গেই ছিল। আসেনি? তবে কি এখনও নীচে একলা কাজ করছে।'

কাইকোয়াড় বললেন, 'নীচে কেউ নেই। আমি শেষে আলো নিভিয়ে এসেছি। কেউ ছিল না ওখানে।'

ব্যস্ত হয়ে এ্যাফোন্সো সাহেব বললেন, 'তবে কি ও জলের দিকে নেমে গেছে। এ্যাকোয়া লাংগুলো দেখুন তো, সবগুলো আছে কিনা?'

হঠাৎ লোপেস লাফিয়ে উঠে বলল, 'সর্বনাশ! ফাটল গলে নীচে নামে নি তো? নীচে তার ঝুলিয়ে আলোগুলো জ্বলছে কিনা বুঝতে না-পেরে বলেছিলাম নীচে গিয়ে দেখে এলে ভালো হতো। আয়াজ বলেছিল, পাথরে দড়ি বেঁধে ঝুলে ও কিছুটা নামতে পারে। ততো শক্তি ওর শরীরে আছে। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তবে

আর কি, নেমে পড়ো। তারপরে দেওয়ালে তার লাগাতে ব্যস্ত হয়েছিলাম। ও নিশ্চয়ই দড়িতে ঝুলছে!'

একটা টর্চ তুলে নিয়ে ছুটল লোপেস।

আমি বললাম, 'দাঁড়ান, দাঁড়ান, একলা কিছু করবেন না। আমাদের থাকতে দিন। নীচে নেমে দেখতে হবে কাউকে, কি হয়েছে আয়াজের!'

সকলেই ছুটলাম ওদিকের ধ্বসের দিকে। সবার আগে পৌঁছে আলোগুলো জ্বালিয়ে দিল লোপেস। ফাটলের মুখের কাছে চৌখো পাথরটাতে দেখলাম, নাইলনের দড়ি বাঁধা। দড়ির একটা মুখ নেমে গেছে ফাটল দিয়ে নীচে। ফাটলের মুখের কাছে শুয়ে পড়ে



হাত বাড়িয়ে দড়িতে টান দিল লোপেস। আলগা দড়ি সর্ সর্ করে উঠে এলো কিছুটা। আতঙ্কে লোপেস চেঁচিয়ে উঠল, 'আয়াজ পড়ে গেছে নীচে!'

'শান্ত হোন আপনি।' ভীষণ গম্ভীরভাবে বললেন গুরুজী। কথার শেষে একটা দড়ির বাণ্ডিল টেনে নিয়ে তার প্রান্তটা নিজের

গায়ে কায়দা করে বাঁধতে লাগলেন। আমাকে বললেন, 'দেখে নিন কি করে দড়ি গায়ে বাঁধতে হয়। সংকেত দিলেই আপনি আমার পরে নীচে নামবেন। দেরি করবেন না। ডাক্তার, তুমি নামবে তার পর। ওষুধের বাক্স ঠিক রাখো।'

দড়ি বাঁধার বিদ্যা বই পড়ে আমরা ভালোই শিখেছিলাম। লোপেসের তিনতলা বাড়ির ছাদ থেকে দড়ি বেঁধে ওঠা-নামা করে হাতে-কলমেও কাজ কিছুটা রপ্তও করেছিলাম। কিন্তু গুরুজীর সামনে দাঁড়িয়ে কেন যেন বুক কেঁপে উঠল। দড়ি ছিঁড়ে আপ্পালা রাজু পড়ে গেছেন। আয়াজের কি হলো কে জানে! গুরুজী নীচে যাচ্ছেন, তারপর আমি। ফিরতে পারবো তো!···জোর করে মনের এ ভাব তাড়ালাম!

একটা পাথরের থামে দড়ি পাক দিয়ে নীচে নামার জন্যে খাদের মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন গুরুজী। বললেন, 'কোনো চিন্তা করবেন না আপনারা। আমার মন বলছে, কোনো বিপদই ঘটেনি। আয়াজ বুদ্ধিমান। সাহসী। শক্তিশালী। ও দড়ি ছিঁড়ে পড়বে না। দড়ি ঢিলে দিন আপনারা।'

[পাঁচ]

সাবধানে ফাটল গলে নিজেকে নীচে নামিয়ে দিলেন গুরুজী। আমরা আস্তে আস্তে দড়ি ঢিলে দিতে লাগলাম। লোপেস ফাটলের কাছ থেকে বলল, 'ফাটলের মুখ বেঁকে গেছে নীচে। অনেকটা ভেতরে। আলো জ্বলছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।'

পঁচিশ মিটারের মতো দড়ি ছাড়ার পর দড়ি আলগা হলো। কিছু পরে জোরে জোরে তাতে দু-বার ঝাঁকানি পড়ল। আমি এগিয়ে গেলাম ফাটলের দিকে। সারা শরীর ফাটলে গলিয়ে বুঝলাম, দুটো বিশাল চাঁইয়ের মাঝের ফাটল এটা। চাঁই-দুটো ভীষণ এবড়ো-খেবড়ো। শরীরে ব্যাথা লাগলেও, আন্দাজে পায়ের গোড়ালি আটকাবার মতো কিছু পেলাম। তাতে নামতে সুবিধাই হলো। পাথরটা আমার থেকে বড় জোর এক হাত ওপরে। কিছুটা নামার পরই ওপরের আলো শেষ হলো! অন্ধকারে পিঠে ভর করে বেঁকা ফাটল দিয়ে কোন্ অতলে নেমে চললাম। মাঝে মাঝে হাত তুলে দেখলাম পাথরটা কতো ওপরে। প্রতিবারেই হাত ঠেকল ওটাতে। আর বুঝতে পারলাম তারটা আমার পাশ দিয়েই নেমে গেছে নীচে। তারের পাশে গুরুজীর দড়িটা আলগা। ও দুটোই আমাকে ওপরের পৃথিবীর কথা মনে করিয়ে দিল। আর কি ফিরে যেতে পারবো ওখানে?

হঠাৎ হড়কে মহাশূন্যের মাঝে পড়ে গেলাম। পাথরটা এখানে বেশ ওপরে ছিল, তাই মাথা ঠুকে গেল না। দড়িতে ঝুলে শূন্যে দুলতে লাগলাম। একটু ঘুরপাকও খেয়ে গেলাম। হাত বার করে এদিকে ওদিকে কিছু ধরার চেষ্টা করেও কিছুই পেলাম না। তাহলে ধ্বস পার হয়ে এসেছি মূল সুরঙ্গে। সুরঙ্গের দেওয়াল তাই

অনেক দূরে সরে গেছে। হঠাৎ আমার হাতে লাগল দড়িগুলো। একটা নয়, দুটো দড়ি। আয়াজ আর গুরুজীর দড়ি। শক্ত করে 'ও দুটো ধরে তিনবার ঝাকুনি দিলাম। তারপরেই ধীরে ধীরে মহাশূন্য দিয়ে নীচে নেমে চললাম। হঠাৎ চোখে ক্ষীণ আলোর সাড়া জাগল। বাতিগুলো জ্বলছে তাহলে! নীচে কি দেখবো কে জানে! দূরের দেওয়ালগুলো অস্পষ্ট দেখা গেল।

কোথাও কোথাও কুলুঙ্গিতে বিশাল মূর্তি আবছা ফুটে উঠল। তাছাড়া বাদবাকি দেওয়াল পাথুরে। কতোক্ষণ যে অমন করে ঝুলে ঝুলে নেমেছি জানি না। আলো ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শেষে নীচ থেকে স্পষ্ট শুনতে পেলাম আয়াজের গলাঃ 'চিন্তা করবেন না সাহেব, আমি ভালোই আছি। আর কিছুটা নামলেই সিঁড়ির ধাপ পাবেন আপনি।'

এখানেও একটা বড় চাটান। এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে, অতলে। বেশ বুঝতে পারলাম, ফিরে যাবার পথে কে বা কারা বারুদজাতীয় কিছু জিনিস দিয়ে মাঝখানের বেশ কিছুটা সিঁড়ি উড়িয়ে দিয়েছে। ধ্বস নেমেছে সেখানেই। হয়তো নীচে এমন ধ্বস আর পাবো না।

গুরুজী বললেন, 'আপনি আর ওকে বকবেন না। ধমক যা দেবার, আমি দিয়েছি। ওর দোষ নেই। লোপেস আর ওর ভুল বোঝাবুঝির ফলেই এমন ঘটেছে। ও ভেবেছিল ওকে টেনে তুলবে কাইকোয়াড় আর লোপেস। কিন্তু হঠাৎ আলো নিভে যাওয়াতে বুঝতে পারে, ওরা ওর নামার ব্যাপারটায় ততো গুরুত্ব দেয়নি।'

আমি বললাম, 'ঐ অন্ধকারে তোমার ভয় করেনি আয়াজ?'

'আলো নিভে যাওয়াতে বেশ ঘাবড়ে গেছিলাম। তবে জানি তো আপনারা আসছেন, তাই ভেবেছিলাম ঘুম লাগাবো! এতো অন্ধকারে কোথাও শব্দ নেই সাহেব, সে ভীষণ বিশ্রী ব্যাপার!

ঘুম আসে না! বাড়ির কথা, আর আজগুবি সব জানোয়ারের কথা মনে পড়ে। আমি নিজে নিজে গান গেয়েছি, চেঁচিয়েছি। মনে হয়েছে সারা গুহাটা সে চিৎকারে ভেঙ্গে পড়বে। তারপর অন্ধকারে হাত-পা ছুঁড়েছি। তবে জায়গা থেকে নড়িনি সাহেব। কোথায় তাহলে পড়ে যেতাম, কে জানে! হঠাৎ আলো জ্বলতে দেখি শূন্য দিয়ে গুরুজী নেমে আসছেন!'

গুরুজী বললেন, 'ফেরার পথে এই মহাশূন্য পাড়ি দেবো কি করে বলুন তো?'

আয়াজ বলল, 'অন্ধকারে বসে বসে সে কথাও ভেবেছি। খুব বেশি উঁচুতে ধ্বসের মুখ নয়। ভয় পাওয়াতেই মনে হয় অনেক উঁচু। দেখুন না, ঐ তো দেখা যাচ্ছে দড়ি নেমে এসেছে। দু-দিকে দড়ি বেঁধে মইগুলোকে পর পর নামিয়ে দেওয়া হোক্ নীচে। সোজা মই বেয়ে উঠে যাবো আমরা ওপরে। খুব সহজ ব্যাপার।'

গুরুজী বললেন, 'একটা কাগজে কি করতে হবে লিখে দিন। মই নামিয়ে ওরাও নেমে আসুক নীচে। আয়াজ আগে এসে দেখছি অনেক কাজ সহজ করে দিয়েছে। আমরা আমাদের প্রোগ্রামের সময় থেকে এগিয়ে আছি।'

একটা দড়িতে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিতেই ওপর থেকে ওরা সেটা টেনে তুলে নিল।

ঘড়ির কাঁটা যখন প্রায় বারোটার ঘর ছুঁই-ছুঁই করছে, মই বেয়ে নেমে এলো লোপেস আর কাইকোয়াড়। ক্লান্তিতে অবশ হয়ে পড়েছি। দড়ির এদিকের মুখ পাথরে পেরেক ঠুকে জায়গা মতো বাঁধতে কাহিল হয়ে পড়েছি। ওদের আনা খাবার, জল খেয়ে রাতের মতো আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা।

শুয়ে শুয়ে লোপেস বলল, 'বেশ যা-হোক্ খেল্ দেখালে আয়াজ! আমার তো নিজের গালে নিজেকে চড় মারতে ইচ্ছে

হচ্ছিল। কান্নাও পাচ্ছিল! আপ্পালা রাজুর হাল হলেই হয়েছিল আর-কি!'

গুরুজী বললেন, 'তাই তো, এতক্ষণ ওর কথা মনে পড়েনি কেন! দড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়ে থাকলে তাঁর দেহাবশেষ কোথাও পাওয়া যেতো। তা তো দেখিনি আমরা! তবে কি দড়ি ছিঁড়ে পড়েনি আপ্পালা রাজু?'

কাইকোয়াড় বললেন, 'তাহলে আমরা এতক্ষণ মিছিমিছি ভাবছিলাম ওর জন্য। দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে চলে গেছেন। দড়িটা ফেলে গেছেন বলেই আমাদের যতো বাজে চিন্তা।'

লোপেস বলল, 'এমন অপূর্ব সবকিছু দেখে গিয়েও তা লোকের কাছে প্রচার করেননি কেন? এ তো সারা বিশ্বের কাছে একটা খবর!'

'হয়তো অনেককেই এ-সব কথা শুনিয়েছিলেন।' কাইকোয়াড় বললেন, 'কিন্তু কেউ বিশ্বাস করেনি। বাধ্য হয়েই ওকে তাই চুপ করতে হয়েছে।'

গুরুজী বললেন, 'আপ্পালা রাজু লেখাপড়া-জানা লোক। কি করে অপরকে কথা বিশ্বাস করাতে হয়, তা তাঁর জানা আছে। সে ফিরে গেলে সারা বিশ্বে একটা তোলপাড় পড়ে যেতো। তা যখন হয়নি, তখন তাঁর ফেরার কথা বিশ্বাস করতে রাজি নই।'

আয়াজ থাকতে না পেরে বলল, 'তাহলে তাঁর কি হলো? তিনি যে এখানে এসেছেন তার প্রমাণ আছে। তিনি নীচে নেমেছেন তারও প্রমাণ আছে। তিনি যে দড়ি ছিঁড়ে পড়ে মারা যাননি তারও প্রমাণ পাচ্ছি। তাহলে···?'

হঠাৎ ঘোর অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে উঠে বসল লোপেস। আলো নীচের সিঁড়ির দিকে ফেলে বলল, 'তাহলে তিনি ঠিক ঐ নীচের অন্ধকার সুরঙ্গের ভেতরে কোথাও আমাদের জন্যে বসে বসে

সময় গুনছেন। গুরুজী, আমাদের আর এতটুকু দেরি করা উচিত হবে না।...'

সবাই আমরা উঠে বসে তাকালাম সিঁড়ির দিকে।

গুরুজী শান্ত গলায় বললেন, 'রাত দিন এখানে সমান। তাহলেও ঘড়ির হিসেব মতোই আমাদের চলতে হবে। সে হিসেবে এখন রাত একটা। শুয়ে পড়ুন সকলে। এতোদিন যদি সে একা থাকতে পেরে থাকে, তবে আরও ক-ঘণ্টা পারবে। অবিশ্যি এ আমাদের সুখ কল্পনা। ডাক্তার, তুমি বলে দাও সকলকে, এতোদিন কেউ এই পরিবেশে একা বাঁচতে পারে না!'

অন্ধকারে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। কথা বলা বন্ধ করল সকলে। বোধহয় সবাই হতভাগ্য আপ্পালা রাজুর ভয়ঙ্কর পরিণতির কথাই মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, খেয়াল নেই।

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙল। আলো জ্বালিয়েছে কেউ। এক কোন্ থেকে রান্নার গন্ধ ভেসে আসছে। আয়াজ বলল, 'উঠে পড়ুন সাহেব। এখন বেলা প্রায় আটটা। আমরা তৈরি হয়ে গেছি। আপনি তৈরি হলেই, নাস্তা সেরে রওনা হবো।'

গুরুজী বললেন, 'আমরা একে অপরের সঙ্গে দড়িতে বাঁধা থাকবো। যদিও সিঁড়ি দিয়ে নামবো আমরা, তবুও বলা যায় না সামনে সিঁড়ির কি হাল। যাঁরা ইচ্ছে করে ধ্বংস করেছে এই পথ, তাঁরা যে আগেও কিছু করেনি, তাই-বা বলি কি করে।...আমি আগে যাবো। সবার শেষে যে, সে নেবে টর্চ। সে-ই দেখাবে আগের লোকেদের আলো।...আয়াজ তুমিই থাকবে সবার পিছনে।'

আয়াজ বলল, 'ঠিক আছে, গুরুজী।'

প্রত্যেকে আমরা নীচে নিয়ে যাবার মালগুলো ভাগাভাগি করে পিঠে তুলে নিলাম। দড়ির বাঁধনে নিজেদের বেঁধে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলাম।

বিশাল সুরঙ্গের দেওয়াল কেটে পাক দিয়ে নেমে গেছে সিঁড়িগুলো। এক পাশে পাথরের রেলিং, অন্য দিকে পাহাড়ের দেওয়াল। সে-দেওয়াল নক্সা কাটা মূর্তি দিয়ে সাজানো। রেলিংয়ের ওপাশে অন্ধকার কুয়োর মতো পাতাল-মুখি একটা গহ্বর হাঁ করে রয়েছে। কতো নীচে যে সমতল জমি তা বুঝতে পারলাম না। আয়াজ মাঝে মাঝে পাশের দেওয়ালে আলো ফেলল। এখানে মূর্তিগুলো দেখতে ভারি সুন্দর। সূক্ষ্ম কারুকাজ করা!

বেশ কিছুটা নেমে একটা চাটানে থামলাম। আয়াজ মূর্তিগুলো দেখবে বলে দেওয়ালে আলো ফেলেই চেঁচিয়ে উঠল, 'সাহেব, এখানেও কি যেন লেখা আছে।···দেখুন দেখুন!'

আমরা তাকিয়ে দেখলাম, একটা তাকের মতো জায়গার ওপরের সমতল পাহাড়ের গায়ে লেখা আছে: 'দড়িটা আমার ভার বইতে না পেরে ছিঁড়ে গেছে। আমি নেমে যাচ্ছি ওদের কাছে। শেষ মোমবাতির আলোয় লিখছি, তোমরা যাঁরা এ লেখা পড়বে, তাড়াতাড়ি এসো। উদ্ধার করো আমাকে আর ওদেরকে। এবং সেই অমূল্য সম্পদ, যা ওরা এতোদিন আগলে রয়েছে। আপ্পালা রাজু। ২৯-১১-৪২।' লেখাটা পড়ে শুনিয়ে দিলাম সবাইকে।

লোপেস চেঁচিয়ে উঠল, 'উনি তাহলে তিনমাস একলা বাস করেছিলেন এই অন্ধকারে! না, না, উনি তো এখনও তাহলে বসে আছেন, নীচে কোথাও আমাদের অপেক্ষায়!···কী ভয়ঙ্কর কথা!'

গুরুজী বললেন, 'কিন্তু আপ্পালা রাজু 'ওদের' বলতে কি বোঝাতে চাইছেন! ওরা কারা?'

কাইকোয়াড় বললেন, 'আর অমূল্য সম্পদটাই-বা কি?'

আয়াজ বলল, 'সামনে সিঁড়িতে কোথাও ভাঙচুর নেই। থাকলে উনি আমাদের সাবধান করে রাখতেন। চলুন তাড়াতাড়ি বাকি ভাবনা-চিন্তা পরে করা যাবে।'

আমরা সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে নেমে চললাম। মনে প্রচণ্ড কৌতূহল, আর গভীর আশঙ্কা!

আপ্পালা রাজু এই সুরঙ্গের মধ্যে বহুদিন বেঁচে ছিলেন। এখনও বেঁচে আছেন কিনা কে জানে! শুধু তাই নয়, ওর সঙ্গে আবার আরও এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁদের বাঁচাবার অনুরোধ তিনি করেছেন!

ভীষণ রহস্যে ভরা সমস্ত ব্যাপারটা!

হঠাৎ গুরুজী বললেন, 'তাহলে হয়তো নৌকোডুবি হয়ে বা অন্য কোনো কারণে আরও কেউ কেউ এই গুহায় বাসা বেঁধেছেন। তারা এখানে আছেন আপ্পালা রাজুর আগে থেকেই। তাঁদের কথাই লিখেছেন আপ্পালা রাজু।'

কথাটা উনি বললেন বটে, কিন্তু কারও মনে তেমন দাগ কাটল না। তা যেন বুঝতে পেরেই বললেন, 'নৌকোডুবি হয়ে মানুষ ডুবো-পাহাড়ের সুরঙ্গে বাসা বেঁধেছে, এটা অবিশ্যি একটু কষ্ট করেই ভাবতে হবে আমাদের।'

আমরা বোধহয় নীচেই পৌঁছে গেলাম। হঠাৎ সিঁড়িগুলো বিরাট লম্বা হয়ে দেওয়ালের প্রায় পুরো একটা দিক জুড়ে গেল। তেমন গোটা দশেক সিঁড়ি নামার পরই, নীচে নামা শেষ হলো আমাদের। একটা ছাদ-ছাড়া হল ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। তিন দিকে দেওয়াল। সে দেওয়ালও অপূর্ব নক্সা-কাটা মূর্তি দিয়ে সাজানো। একদিকে ফটকের আকারে একটা বিকট মুখ হাঁ করে রয়েছে। ভয়-জাগানো সে মুখের কারুকাজ। সেখান থেকেই সমতল সুরঙ্গের আরম্ভ!

আমরা নিজেদের দড়ির বাঁধন খুলে ফেললাম। একটু দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিলাম। সামনে যে কি রহস্য ঘোর অন্ধকারে লুকোন আছে, কে জানে! অতীতের এক প্রেতপুরীতেই ঢুকবো ভেবে-ছিলাম। আপ্পালা রাজুর লেখাগুলো সব কিছু ওলটপালট করে

দিয়েছে। রহস্য আরও গভীরে! এর শেষ এখন কিসে তা আর কল্পনাও করতে পারছি না!

সামনে এগোলেন গুরুজী। আমাদের সবার হাতেই টর্চ। তবে একসঙ্গে তা জ্বালছি না। জমাট-বাঁধা অন্ধকারে একজনের হাতের আলোতেই আমরা এগোচ্ছি। গুহা-মুখ এখানে তেমন বড় নয়। দু-পাশের দেওয়াল মসৃণ করে কাটা। মাথার ওপরেও তাই। মনে হয় ছোট একটা ফাটলকে কেটেই এই গুহা-মুখ বানানো হয়েছিল। কুড়ি মিটারের মতো লম্বা হবে এটা। সেটা পার হয়েই থমকে গেলাম! আমাদের সামনে বিশাল এক প্রাকৃতিক সুরঙ্গ। দু-পাশে বা ওপরে কোথাও টর্চের আলো পৌঁছালো না। সামনেও এই সুরঙ্গ যে কতো দূরে গিয়েছে, বুঝতে পারলাম না।

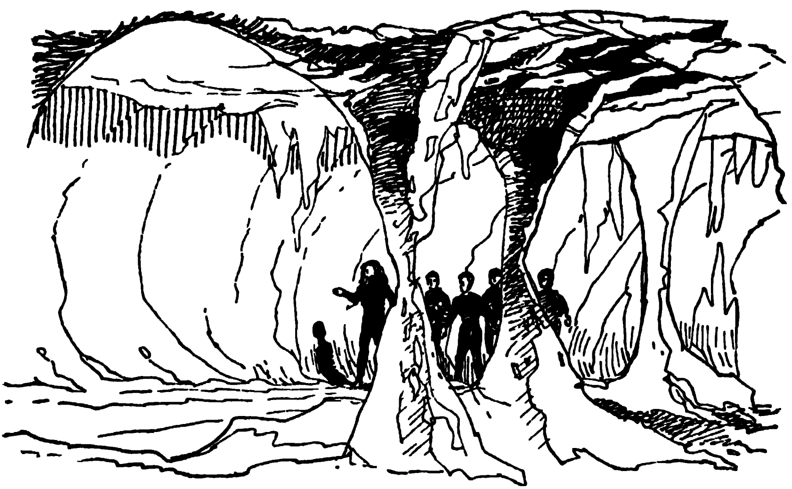
গুরুজী বললেন, 'এবারে আমরা কোন্ দিকে যাবো? এখানে তো পথ হারাবো আমরা!'

আয়াজ নীচে আলো ফেলে কি যেন দেখছিল। বলল, 'না গুরুজী, পথ হারাবো না। এই দেখুন নীচে পাথর কেটে পথ বানানো আছে। অন্য দিকে আর কোনো পথ নেই। চলুন এগিয়ে যাই আমরা।'

নিঃশব্দে সে পথ ধরেই এগোলাম। এখানে সামনের বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে ওপর থেকে ফোটা ফোঁটা জল চুঁইয়ে পড়ছে। কিছুটা এগোতেই বাঁ-দিকে অদ্ভুত কতোকগুলো পাথুরে থামের মতো জিনিস নজরে পড়ল। সাদা জিনিসগুলো আলোয় চক্ চক্ করছে। ভেজা তাদের গা। সবগুলোই আবার থামের মতো নয়। কতোকগুলো ছোট ঢিপির আকারে। বাঁদিকে যদ্দুর নজর গেল থাম আর ঢিপিতে ভরা!

গুরুজী বললেন, 'বইতে পড়েছেন স্ট্যালাগটাইট ও স্ট্যালাগ-মাইটের কথা, এগুলো তাই। ওপরের ছাদ দিয়ে যে জলের ফোঁটা পড়ছে, তা আসছে চুনাপাথরের স্তর ভেদ করে। জলের সঙ্গে

সামান্য পরিমাণে আসছে গোলা ক্যালসিয়াম কারবোনেট। ছাদ থেকে ঝরে পড়ার আগে জলের ফোঁটা যতোটুকু সময় ঝুলে থাকে, হাওয়ার স্পর্শে এসে তার মাঝেই তার কিছু ক্যালসিয়াম কারবোনেট জমাট বেঁধে যায়। তেমন করে জমে ওঠা বিন্দু বিন্দু ক্যালসিয়াম কারবোনেট দিয়েই গড়ে ওঠে উইয়ের বাসার মতো সরু, ফাঁপা বা জমাট-বাঁধা কতোকগুলো জিনিস, যা ক্রমে ছাদ থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় নেমে আসে নীচে। জমাট ক্যালসিয়াম কারবোনেটের এই ঝুলন্ত জিনিসগুলোকেই বলে স্ট্যালাগটাইট। ছাদ থেকে শূন্যে ঝুলে



থাকা উইয়ের বাসা দেখেছো? এ অনেকটা তেমনি গড়নের। ক্রমে বহু যুগ ধরে জমে ওঠা ক্যালসিয়াম কারবোনেট পেয়ে ওগুলো মোটা হয়, শক্ত হয়। নেমে আসে আরও নীচে। ক্রমে ক্রমে ঢিবি বা থামের মতো একটা জিনিস গড়ে ওঠে। স্ট্যালাগমাইট যেখানে আছে, ঠিক তার ওপরে তাই একটা স্ট্যালাগটাইট থাকতেই হবে। বহু যুগ পরে দুটোতে জোড়া লেগে যায়। তখনই ওগুলো থামের আকার নেয়। এখানকার স্ট্যালাগটাইটগুলো দেখে একথা

অনায়াসেই বলতে পারি, এই গুহা বহু যুগ আগে আপনা থেকেই প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ অনেক পরে এটাকে খুঁজে বার করেছে।'

স্ট্যালাগমাইটের জঙ্গলের পাশ দিয়ে একটু বেঁকে গেছে পথটা। আরও কিছুটা এগোতেই, হঠাৎ আমরা যেন একটা দেওয়ালের সামনে পৌঁছে গেলাম। অন্ধকারে আমাদের পথ আটকে দেওয়ালটা যে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তা আমরা দেখতেই পাইনি। কাইকোয়াড় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এও তো দেখছি বারুদ জাতীয় কিছু দিয়ে পাথর উড়িয়ে পথ বন্ধ করা হয়েছে। আমরা এগোবো কি করে ?'

সবগুলো আলো জ্বেলে আমরা এদিক ওদিকে দেখতে লাগলাম। কোনো সন্দেহ নেই, অতীতের সেই মহাযুদ্ধের প্রচণ্ড ধ্বংস শক্তি কাজে লাগিয়ে সুরঙ্গের পাথর খসিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এ দেওয়ালের ওপাশে কি আছে ? দড়ি ছিঁড়ে আপ্পালা রাজু কোথায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। নাকি সুরঙ্গের এখানেই শেষ ?

হঠাৎ দেওয়ালের এক জায়গায় আলো ফেলে গুরুজী বললেন, 'দেখুন তো মিস্টার রয়, এখানে পাশাপাশি খসে পড়া ক-টা পাথরের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়ে ঢোকার মতো একটা ফোকর রয়েছে না ·· ?'

আমাদের সবার নজর সে-দিকেই পড়ল। লোপেস এক লাফে সেখানে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ফোঁকরটা দেখে বলল, 'হ্যাঁ গুরুজী, এর মধ্যে অনায়াসে একটা মানুষ ঢুকতে পারে। কিন্তু হামগুড়ি দিয়ে একেবেঁকে তাঁকে এগোতে হবে। পাশ ফিরতে পারবে না। এর মধ্যে ঢোকা কি উচিত হবে।'

টর্চের আলো ফেলে যদ্দুর দেখা গেল, মনে হলো ভেঙ্গে-পড়া পাথরের মধ্যে আপনা থেকেই একটা গুঁড়ি-পথ তৈরি হয়েছে। ও পথে এগোতেই পারবে কোনো-মতে একজন। দেওয়াল পার হয়ে

বাইরে বার হতে পারলে, তবেই সে আবার উল্টো মুখে ফিরতে পারবে। অবিশ্যি তা সম্ভব হবে যদি দেওয়ালের ওপারে বার হতে পারেন মানুষটি, তবেই।

আমি সব দেখেই বললাম, 'ও পথে এগোনো সম্ভব নয়। কারণ এ তো ঠিক নেই যে আমরা ওদিকে পৌছাতে পারবো। মাঝ পথে কেউ আটকে গেলে, তাঁকে মরতেই হবে।'

একটু ইতস্তত করে গুরুজী বললেন, 'তা হোক, আমি আগে ঢুকছি ও পথে। আমার কোমরে-দড়ি বাঁধা থাকবে। যদি আটকে যাই, টেনে বার করবেন আপনারা। তা না-হলে, না-হয় মরবো আমি। আর যদি ওপাশে বার হয়ে যেতে পারি, দড়িতে ঝাঁকানি দেবো, তখন অন্যজন এগোবেন।'

আমরা সবাই প্রায় এক সঙ্গেই যেন বললাম, 'অসম্ভব। এ কাজ আপনাকে করতে দেবো না।'

হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে গুরুজী বললেন, 'সে কী! আপ্পলা রাজু যাঁদের উদ্ধার করতে বলেছে, তাঁদের কথা না ভেবেই ফিরবো আমরা? না, না, তা হতে পারে না।'

ওর কথা থামার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ফোকরের ওপার থেকে ভেসে এলো অদ্ভুত একটা আওয়াজ। যেন অতি ক্ষীণ কণ্ঠে কেউ সুর করে কিছু পাঠ করছে। ক্ষীণ সুর, কিন্তু স্পষ্ট মানুষের গলা।

[ছয়]

ঝাঁপ দিয়ে ফোঁকরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন গুরুজী, আয়াজ তাঁকে ধরে ফেলল। উনি ছাড়াবার জন্য ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করলেন ঃ 'ছেড়ে দাও আমাকে। ছেড়ে দাও। ও গলা আপ্পালা রাজুর। আমি চিনেছি। আমাকে ওদিকে যেতেই হবে।'

লোপেস হঠাৎ বলল, 'ছেড়ে দাও আয়াজ।·· সাবধানে এগোন গুরুজী। আমরা আছি, কোনো ভয় নেই। এটাই ওদিকে একমাত্র যাবার পথ। এই দেখুন এই পাথরের গায়ে কেমন অস্পষ্ট লেখা রয়েছে ঃ 'নিরাপদ।'···দেখছেন ?'

তবুও কোমরে দড়ি বেঁধে দেওয়া হলো। হুড় হুড় করে দড়ি টেনে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। খানিক পরেই বার-কতোক ঝাঁকানি দিয়ে কোমর থেকে বোধহয় দড়িটা খুলে ফেললেন। দড়ি আলগা হয়ে গেল। পরক্ষণেই ওপাশ থেকে চিৎকার শোনা গেল ঃ 'আপ্পালা রাজু, তুমি কোথায় ?···কোন্ দিকে ?'

আমি এগোলাম এর পরে। ফোঁকরটা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছে পাথর পড়ে। তাই একটু উঁচু-নীচু। তাহলেও অনায়াসেই দেওয়ালের অন্য পাশে নামলাম।

এদিক ওদিক আলো ফেলে গুরুজী তখনও চেঁচাচ্ছেন ঃ 'কোথায় তুমি আপ্পালা রাজু? কোথায় ?···এইমাত্র তোমার গলা শুনতে পেলাম। অন্ধকারে আমি দিক্ ঠিক করতে পারছিনা। তুমি এগিয়ে এসো। আর কোনো ভয় নেই।'

হঠাৎ দূর থেকে ক্ষীণ গলার স্বর ভেসে এলো, 'আলো নেভাও। আলো নেভাও। উঃ, কী ভীষণ আলো! দোহাই, আলো নেভাও।'

আলো নিভিয়ে দিয়ে গুরুজী বললেন, 'অন্ধকারে আমাদের দেখতে পাবে কি করে? এদিকে এসো। এই দিকে আমরা।'

আমাদের দুজনের পিছনে তখন যেন আর একজন এসে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হলো। সে যে আমাদেরই কেউ, তাতে



সন্দেহ নেই। কাইকোয়াড়ের চাপা গলা শুনতে পেলাম, 'এ যে অবিশ্বাস্য! আপ্পালা রাজু বেঁচে আছেন এই ভীষণ অন্ধকারে!'

থপ্ থপ্ করে কি যেন এগিয়ে এলো একেবারে সামনে। মানুষ কি অমন করে চলে!…কিছু বোঝার আগেই খুব ক্ষীণ গলায় কে যেন বলে উঠলেন, 'তোমরা এসেছো?…তোমরা কে?…আজ কতো তারিখ?'

গুরুজী বললেন, 'আজ জুলাই মাসের দুই তারিখ। উনিশশো সাতাত্তর।…আপ্পালা রাজু, আমি নারায়ণ চৌবে। মনে নেই, আমরা দুজনে এক সঙ্গে এক গুরুর কাছে রামায়ণ-মহাভারত পাঠ নিতাম।'

'নারায়ণ, তুমি এসেছো। কিন্তু··এতো দেরি করে!' ক্লান্ত আপ্পালা রাজু বললেন, 'সেই বেয়াল্লিশ সালে আমি ঢুকেছিলাম এই গুহার মধ্যে।···আজ সাতাত্তর। কতো বছর কেটে গেল তাহলে··· ?'

'যতো বছরই যাক্ কেটে, আমরা এসেছি।' বললেন গুরুজী, 'আর ভয় নেই তোমার। আমরা তোমাকে নিয়ে যাবো এখান থেকে।

আমাদের কথার মাঝেই অন্যরাও ওপার থেকে এদিকে এসে গেছে। লোপেস বলল, 'সত্যিই, আমরা আপনাকে নিয়ে যাবো। ফেরার পথ করে রেখে এসেছি পিছনে। সে পথ পাকা।'

'আর ওদের কি হবে? ওরা কি পড়ে থাকবে এখানেই··· ?'

'কাদের কথা বলছেন আপনি?' জিজ্ঞেস করলেন কাইকোয়াড়, 'ওপরে আপনার লেখা আমরা পড়েছি। কিন্তু বুঝতে পারিনি কাদের কথা লিখেছেন! ওরা কারা? ডুবে যাওয়া কোনো জাহাজের নাবিক?'

'না, না।' কেমন যেন ব্যস্ত হয়েই বললেন আপ্পালা রাজু, 'ওদের কথা পৃথিবীর সকলেই ভুলে গেছে। ওরা যুগান্তরের মানুষ। মহাভারতে ওদের সম্বন্ধে কিছু লেখা আছে। সেই নামে ডাকলে ওদের পরিচয় নিবাত কবচ। ওরা দৈত্য বা অসুর বংশের মানুষ। ওদের পূর্বপুরুষরা পাতাল জয় করে পাতালে দুর্গ বানিয়ে বাস করতেন। ওরা তাঁদেরই বংশধর।'

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে গুরুজী বললেন, 'কোথায় তাঁরা? আমরা তাঁদের নিয়ে যাবো ওপরে।'

হাল্কা হাসি যেন ভেসে এলো অন্ধকারের মধ্যে: 'সূর্যের আলোর ছোঁয়াচ পেলে তাঁরা কি আর বাঁচবে? কয়েক হাজার বছর ধরে যে এই অন্ধকারে বন্দী হয়ে আছে! তাঁরা অন্ধ। তাঁরা মানুষের দেহধারী অদ্ভুত এক জীব!'

লোপেস বলল, 'আলো জ্বালবো আমরা?'

'আলো?' জিজ্ঞেস করলেন আপ্পালা রাজু, 'এতো বছর অন্ধকারে থেকে আমিও অন্ধ হয়ে গেছি। তবুও আমার চোখ আছে। চোখের পাতা আছে। কে যেন একটু আগে আলো জ্বেলেছিল, একটা অদ্ভুত অনুভূতি জেগেছিল আমার চোখে। আমি তা সইতে পারিনি। আমি ভুলে গেছি আলো কি জিনিস। জ্বালো আলো, অন্য দিকে মুখ করে জ্বালো, দেখি সইতে পারি কিনা!'

টর্চের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে আলো জ্বালল লোপেস।

'উঃ!' চেঁচিয়ে উঠলেন আপ্পালা রাজু। লোপেস তাড়াতাড়ি পকেট থেকে তার রুমাল বার করে টর্চের মুখ বেঁধে ফেলে বলল, 'এখনও কি আপনার কষ্ট হচ্ছে?'

'থাক্, আলো থাক্। আমাকে এ অনুভূতি সইতেই হবে। তোমরা তো আর অন্ধকারের জীব নও, অন্ধকার তোমরা সইতে পারবে কেন?···আলো, আলো, উঃ! কী ভয়ঙ্কর আলো!'

ভূতের মতো কে-যেন দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে। চুল দাড়ি গোঁফ জট বেঁধে গেছে। চামড়ায় ঢাকা হাড় ক-খানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ফেকাসে হয়ে গেছে দেহের চামড়া। পরনে জলজ উদ্ভিদের আঁশ দিয়ে বোনা একটা অদ্ভুত কাপড়।

'তোমরা ক-জন এসেছো নীচে?' শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন আপ্পালা রাজু।

গুরুজী বললেন, 'আমরা পাঁচজন এসেছি নীচে। আমাদের আরও দুজন সঙ্গী ওপর সুরঙ্গে অপেক্ষা করছেন।'

'আসতে খুব কষ্ট হয়েছে? আমার লেখা থেকে পথ নির্দেশ পেয়েছিলে?·· কেউ যে এখানে আসতে পারবে কোনোদিন, সে বিশ্বাস আমার ছিল না। তবুও পাগলের মতো যা-তা লিখে রেখেছিলাম দেওয়ালে। যতক্ষণ মোমের আলো ছিল!'

কাইকোয়াড় বললেন, 'ভাগ্গিস লিখে রেখেছিলেন। নইলে শেষ ধ্বসের কাছ থেকেই হয়তো আমরা ফিরে চলে যেতাম।'

'এসো তোমরা আমার সঙ্গে। আগে বিশ্রাম করো। তারপর সব বলবো। কতো-কিছুই-না করার আছে তোমাদের! তা কিন্তু তোমাদের করতেই হবে।' বললেন আপ্পালা রাজু।

আমরা ওঁর পিছন পিছন এগোলাম। সামান্য আলোয় প্রতি পদে ঠোকর খেতে লাগলাম। এক জায়গায় এসে একটু থেমে আপ্পালা রাজু বললেন, 'ডান দিকে বেশ জোরে আলো ফেলো তো।. ফেলেছো?···কি দেখছো?'

কয়েকটা টর্চের আলো পড়তেই সামনে বিরাট একটা যন্ত্রের ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল! বিশাল যন্ত্র, চাকা, পাইপ জাতীয় অংশ, বয়লার, আরও কতো-কি যেন ভেঙ্গে পড়ে রয়েছে ওখানে। কালো ধাতুর তৈরি যন্ত্র। বোধহয় লোহা, কিন্তু এতটুকুও মরচে পড়েনি!

'কি ওটা?' জিজ্ঞেস করল লোপেস।

'ওটা ছিল ইলেকট্রিসিটি জেনারেটিং সেট। সমুদ্রের জলের অনু-পরমাণুর শক্তি থেকে ওটা চলতো। এ শক্তির কথা পৃথিবীতে কেউ জানে না।'

লোপেস বলল, 'অনু-পরমাণুর শক্তির কথা আজকাল জেনেছে মানুষ। সে শক্তি তারাও কাজে লাগিয়েছে।'

'বাঃ! খুব ভালো কথা। কিন্তু হাজার হাজার বছর আগে নিবাত কবচরা ঐ শক্তি কাজে লাগিয়েছিল। সমস্ত গুহার ভেতরটা তখন আলোয় ঝলমল করতো।'

পাওয়ার হাউসের কাছ থেকে কথা বলতে বলতে আমরা এগোচ্ছিলাম। এবারে অন্য দিকে আলো ফেলতে বললেন আপ্পালা রাজু। সেদিকেও বিশাল এক যন্ত্র। তার গায়ে মনে হলো বড় বড় চোঙ্গার মতো কি সব লাগানো!

'এটা হচ্ছে বাতাস বানানোর কল। সারা গুহায় ঐ যন্ত্রটা দিয়ে বাতাস বইয়ে দেওয়া হতো।'

অবাক বিস্ময়ে আরও এগিয়ে চললাম। গুহার এদিকটা ছিল বোধহয় যন্ত্র-ঘর। এপাশে ওপাশে নানানরকম যন্ত্র বসানো। কোনোটা দিয়ে গুহার ভেতর ঠাণ্ডা গরম করা হতো। কোনোটা গুহার দূরতম অংশের সঙ্গে টেলিফোন ধরনের যোগাযোগ রাখতো। এমনকি টেলিভিশন বা রেডিও ধরনের ব্যাপারও ছিল গুহাতে। একটা জায়গায় আর একটা বিশাল যন্ত্র দিয়ে গুহার ভেতরের ময়লা জল, নোংরা ইত্যাদি টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলা হতো সমুদ্রের ভেতরে অনেক দূরে। সব যন্ত্রগুলোই কে বা কারা চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। এ ধ্বংস যে মানুষেরই হাতে করা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ময়লা জলের যন্ত্র পার হতেই কানে এলো জল যাওয়ার হাল্কা শব্দ। দূরে কোথাও জলের স্রোত বয়ে চলেছে একটানা।

সেদিকেই এগোলেন আপ্পালা রাজু। হঠাৎ মনে হলো, গুহার ওপরের ছাদ যেন ঢালু হয়ে নেমে এসেছে সামনে। দু-দিকের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া দেওয়ালগুলোও যেন বেগে এগিয়ে এলো কাছে। আমরা বোধহয় গুহার একদিকের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি!

সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে অদ্ভুত ধরনের সুন্দর দেখতে হাজার স্ট্যালাগটাইট ছাদ থেকে ঝুলছে, অবিশ্রান্ত ধারায় সেখানে জল চুইয়ে পড়ছে। এখানে স্ট্যালাগটাইটগুলো নীচের দিকে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই এঁকে-বেঁকে ডাল-পালা ছড়িয়ে ওপর দিকেও উঠে গেছে!

আপ্পালা রাজু বললেন, 'এগুলোকে বলে হেলেকটাইট। আসলে স্ট্যালাগটাইটের ভিন্ন রূপ। কী করে ক্যালসিয়াম কারবোনেট জমে ওপর দিকে উঠছে, তা নিয়ে অনেকের অনেক মত।

অনেকে বলেন, ফাঁপা টিউবের স্ট্যালাগটাইটের মধ্যে দিয়ে ক্যালসিয়াম কারবোনেট গোলা জলের ফোঁটা খুব আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে। ফলে টিউবের মুখের কাছে ক্যালসিয়াম কারবোনেট জমে বেশি। সেই জমাগুলোই ক্রমে ওপর দিকে ঠেলে ওঠে। একটু ঠেলে ওঠার পর সরু নলে যে কারণে জল আপনা থেকেই ওপরে উঠে যায়, সেই ক্যাপিলরি কারণেই ডাল-পালা ওপর দিকে গজিয়ে উঠতে থাকে। সাবধানে এই জায়গা দিয়ে এগোও তোমরা, সামনে ভীষণ পিছল। ও জায়গাটা আমাদের পার হতেই হবে।'

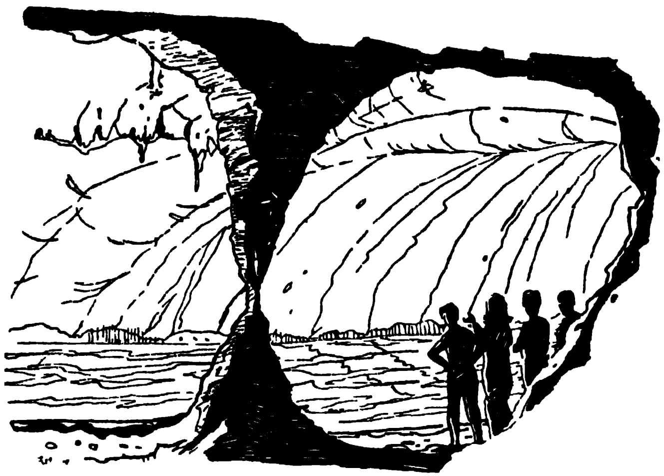
সাবধানে এগিয়ে প্রায় পায়ের পাতা ডোবা হাল্কা জলের স্রোতের মধ্যে পড়লাম। সত্যিই, ভয়ানক পিছল জায়গাটা। আমরা অনেকেই পড়তে পডতে কোনো-মতে সামলালাম। এ ধারাস্রোত পার হতেই সামনে পড়ল বিরাট একটা জায়গা, যেখানে পাশাপাশি ছোট ছোট নানান আকারে জলের চৌবাচ্চার মতো কতোকগুলো জিনিস রয়েছে। সবগুলোই প্রায় জমি থেকে মিটার খানেক করে উঁচু।

আপ্পালা রাজু বললেন, 'এও ঐ ক্যালসিয়াম কারবোনেটের খেলা। এবড়ো-খেবড়ো জমিতে জল আটকে ধার ঘেষে ক্যালসিয়াম কারবোনেট জমে অমন দেখতে হয়েছে। নীচের জমি যেমন এবড়ো-খেবড়ো, ওগুলোর চেহারাও তেমন! এরকমভাবে ক্যালসিয়াম কারবোনেট জমে আরও বড় বড় বাঁধের মতো জিনিস হয়। এই গুহার চারদিকেই তেমন অনেক বাঁধ আছে।'

হঠাৎ এক দিকে আলো ফেলে লোপেস বলল, 'ওগুলো কি? ঐ ওগুলো?'

দেখলাম এক দিকের দেওয়ালের কাছ ঘেষে যেন লালচে আর বাদামী রংয়ের পরদা মতো কিসব ভাঁজে ভাজে খাটানো আছে। না-দেখেই আপ্পালা রাজু বললেন, 'ওগুলোও সেই স্ট্যালাগটাইট

আর স্ট্যালাগমাইটের জোড়-লাগা এক ধরনের রূপ। ওপরের চুনাপাথরের ছাদে বড় বড় ফাটল আছে, সেই ফাটল দিয়ে যুগ যুগ ধরে ক্যালসিয়াম কারবোনেট গোলা জল ঝরে পড়ে অমন দেখতে হয়েছে। বোধহয় লোহা পাথরও আছে ওপরে। তাই



মরচে ধরে অমন রং দেখাচ্ছে।…এ সব নয়। এখানকার সব থেকে আশ্চর্য জিনিস দেখবে এসো তোমরা।…জলের স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছো? সামনে গুহার তল দিয়ে বিশাল এক নদী বয়ে গিয়েছে। · মিষ্টি জলের নদী। ঐ স্রোতের শব্দ তারই। ঐ নদীই এখানকার সবাইকে বাঁচিয়ে রেখেছে।…এসো, দেখবে এসো।'

সামনে দেওয়ালের গায়ে একটা বড় ফোঁকরের কাছে গিয়ে থামলাম আমরা। খসে পড়া কতোকগুলো পাথরকে সিঁড়ির মতো ব্যবহার করে ফোকরের মধ্যে ঢুকে গেলেন আপ্পালা রাজু। আমরাও পিছন পিছন এগোলাম। এটা একটা উঁচু তলের গুহা। ফোঁকরের সামনে পৌঁছাতেই জলের স্রোতের শব্দ বাড়ল। পথ বেয়ে কিছুটা এগিয়ে থামতে হলো আমাদের। বিশাল আর-একটা

গুহার মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। সামনেই গুহার তল দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। বিরাট নদী, কোথা থেকে এসেছে আর কোথায় বয়ে যাচ্ছে, বোঝা গেল না।

আপ্পালা রাজু বললেন, 'ওদিকটা আগে যন্ত্র-ঘর ছিল। সেখানে বাস করতো যন্ত্রবিদরা। যাঁরা মাছ ধরতো, তাঁরা বাস করতো এই নদীর ধারে। আর মূল গুহা, যেখানে নগর বসিয়েছিল নিবাত কবচেরা, তা ছিল ঠিক উল্টোদিকের আর-একটা গুহায়। সে সব ধ্বংস হয়ে গেছে। ধ্বংস করা হয়েছে, বলতে পারো। কেউ আর তার মধ্যে ঢুকতে পারবে না। সেখানে হাজার হাজার মৃত নিবাত কবচেরা পাথরের কবরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।'

কাইকোয়াড় বললেন, 'কিন্তু আপনি কেন বললেন, তাঁরা এখনও বেঁচে আছেন? কোথায় তাঁরা?'

'সময় হলেই ঠিক দেখা পাবে তাঁদের।' বললেন আপ্পালা রাজু, 'এখন তোমরা বিশ্রাম করো। আমি ওদের খবর দিতে যাই। মনে রেখো, অনেক কাজ করতে হবে কিন্তু তোমাদের। অনে—ক কাজ। আর তা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। নইলে··· নইলে হয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে এই অন্ধকারে বন্দী বাতাসের অন্ধ মানুষগুলোর।···'

এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট সুরঙ্গের মুখ দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ঐ তোমাদের থাকার জায়গা। বেশ আরামেই থাকতে পারবে। যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে। কিন্তু সাবধান, নদীতে নামবে না। সামনেই নদী এক পাতাল কূপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাতে পড়লে হারিয়ে যাবে চিরকালের মতো।···'

আর দাঁড়ালেন না। থপ্ থপ্ করে আরও সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে গভীর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

গুরুজী বললেন, 'ওর আবার দেখা পাবো তো আমরা?

অন্ধকারে চিরকালের মতো হারিয়ে গেলেন না তো! কেন যেতে দিলাম ওকে?'

আমি বললাম, 'অন্ধকারই ওর সয়ে গেছে। আবার নিশ্চয়ই আসবেন। শুনলেন না আমাদের দিয়ে কি-যেন করিয়ে নিতে চান। যা না-করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

লোপেস বলল, 'ঘড়িতে দেখছি বিকেল হয়েছে। শরীর আর সইছে না। পিঠের বোঝা নামাতে হবে। চলুন, গুহা-ঘরে ঢুকি আগে!'

আলো জ্বেলে ভেতরে ঢুকে দেখলাম, বেশ লম্বা চওড়া ঘরের মতো গুহাই বটে। মেঝে বেশ সমতল। তাড়াতাড়ি মালপত্র নামিয়ে গা এলিয়ে দিলাম। আলো নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকারেই আমাদের কথা-বার্তা চলতে লাগল।

গুরুজী বললেন, 'এখানকার পুরো ইতিহাস জানতে হবে। মানুষজনের কথা, তাঁদের শিক্ষাদিক্ষার কথা। যুদ্ধের কথা। এমনকি কী করে এ সভ্যতা ধ্বংস হলো, তা-ও।'

আমি বললাম, 'এখানে প্রায় সব ধরনের যন্ত্রই দেখতে পেলাম। শুনলাম, ওদিকে সুরঙ্গে নগর বসিয়ে ছিল নিবাত কবচেরা, কিন্তু কী আশ্চর্য! নগরে কি জল সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল না? পাম্প জাতীয় কোনো যন্ত্রই তো দেখতে পেলাম না!'

লোপেস বলল, 'হয়তো দেখেছি, বুঝতে পারিনি। জল ছাড়া মানুষ বাঁচে না। ও যন্ত্র ছিলই।'

কাইকোয়াড় বললেন, 'আর একটা ভুল হয়ে গেছে আমাদের। অমূল্য সম্পদের কথা তো আপ্পালা রাজুকে জিজ্ঞেস করা হলো না। কি হতে পারে সেই সম্পদ? মণি বা দামী কোনো পাথর? যা ছিল এই সুরঙ্গের গভীরে!'

আয়াজ বলল, 'সব কথা পরে হবে। আলো জ্বালি। খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আর থাকতে পারছি না।'

সত্যি! ভীষণ খিদে পেয়েছে! আলো জ্বালিয়ে আগুনে খাবার গরম করে, গোগ্রাসে খেলাম।

আয়াজ বলল, 'নদী থেকে জল নিয়ে আসি?···'

ভীষণ ধমক দিলেন গুরুজী, 'নদীর কাছে কোনো অবস্থাতেই যাওয়া হবে না।···মনে থাকে যেন কথাটা।'

লোপেস বলল, 'আমি ভাবছি শুধু নিবাত কবচদের কথা! কেমন দেখতে হবে ওদের! আমাদেরই মতো তো? দৈত্য বা অসুর বলতে তো ভয়ঙ্কর কিছু বোঝায়! দেখে আঁৎকে উঠতে হবে না তো?'

গুরুজী বললেন, 'মানুষই ছিল দৈত্য বা অসুরেরা। ভিন্ন জাতির মানুষ। তবে মনে রেখো, প্রায় চার-পাঁচ হাজার বছর ধরে তাঁরা এই গুহার অন্ধকারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন। আগের থেকে তাঁদের দেহে তাই অনেক পরিবর্তন আপনা থেকেই হয়েছে। এখন তাঁদের দেখতে কেমন হবে, কে জানে!'

কতোক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ শরীরে বিশ্রী একটা স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হলো, ঘোর অন্ধকারে কি যেন আমার ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। সে-ই আমাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করছে! শক্ত খসখসে সে স্পর্শ! আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলাম। পাশ থেকে সে সরে গেল। লোপেসের গলা শুনলাম, 'কী হয়েছে মিস্টার রয়?···কী হয়েছে?'

আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম, সামনেই জড়ো-সড়ো হয়ে রয়েছেন আপ্পালা রাজু। আলো জ্বলতেই দুই হাতে চোখ ঢেকে কাঁপা গলায় বললেন, 'এমন ভয় পেয়ে যাবেন ভাবিনি। আসলে মানুষের মতো চলার অভ্যেসগুলো একদম ভুলে গেছি। আমার চলাফেরা এখন এই দেশের লোকেদের মতোই হয়ে গেছে। সব কিছু বুঝতে চাই হাতের ছোঁওয়ায়।'

সবার ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। হাতঘড়িতে দেখলাম প্রায় আট ঘণ্টার মতো ঘুমিয়েছি আমরা। তার মানে একটা পুরো দিন কাটিয়েছি এই অন্ধকারে বন্দী বাতাসের রাজত্বে। এখন ভোর হয়েছে পৃথিবীর বুকে। হয়তো সকলে বিছানা ছাড়বো-ছাড়বো করছে। আর এখানে দিন রাত সবই সমান।

গুরুজী জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তাহলে আমাদের কি করতে হবে?…তার আগে বরং তুমি এখানকার ইতিহাসের গল্প বলো।… তুমি কি নিবাত কবচদের সঙ্গে ভাব করেছো? ··তাঁদের কথা কি বুঝতে পারো?'

'এক যুগ কেটেছে ওদের সঙ্গে। আমি তো এখন ওদেরই মতো হয়ে গেছি। ওরাই আমার সব। ··হ্যাঁ, ওদের কথা শোনো। দৈত্য বা অসুর সভ্যতার একটা বড় অংশ তাঁদের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বলে সমুদ্র জয় করেছিলেন। তাঁরা পৃথিবীর মাটি ছেড়ে বেশি নিরাপত্তার জন্য সাগরতলে বাসা বেঁধেছিলেন। পৃথিবীর নানান অংশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রধান নগর, রামায়ণে যার নাম লেখা হয়েছে ভোগবতী বলে, তা ছিল এখানেই। পুরাণে লেখা আছে এরা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে নিরাপদে সমুদ্র-মধ্যে বাস করার অধিকার লাভ করেন। দেবতারাও এদের বধ করতে পারতেন না। আসলে এরা ছিল প্রচণ্ড পরাক্রমশালী। কারণ বিজ্ঞান ছিল এদের আয়ত্তে!

রাবণ রাজা একবার এদের আক্রমণ করেন। বেশ কিছুদিন যুদ্ধ করার পর এদের সঙ্গে সন্ধি করেন। রাবণ রাজাও ছিলেন বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। তিনি স্বর্গের সিঁড়ি বানাবার আয়োজন করেছিলেন। তা আর কিছুই নয়, অদ্ভুত আকাশযান—যা মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে গ্রহান্তরে পৌঁছাতে পারে। মহাযাত্রায় সময় যা লাগবে, তাতে কোনো দেহধারীর পক্ষেই যাত্রা শেষ করা সম্ভব নয়। সম্ভব তাঁরই পক্ষে, যে, মহাযাত্রাকালে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি

এক ঘুমে ঘুমিয়ে, সময় মতো জেগে উঠতে পারেন। সে উপায়ও আবিষ্কার করেছিলেন মহাবৈজ্ঞানিক কুম্ভকর্ণ। রাবণ রাজার স্বর্গ যাত্রার আয়োজনে নিবাত কবচ বৈজ্ঞানিকরাও নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

আয়োজন যখন প্রায় সম্পূর্ণ, তখন এক মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন রাবণ রাজা। রামায়ণে তার কথাই লেখা আছে। রাবণ রাজা বুঝতে পেরেছিলেন জয় তাঁর হবে না। জয়ী হবেন রাম। তখন গোপনে, আকাশযানের সম্পূর্ণ নক্সা নিবাত কবচদের কাছে গচ্ছিত রাখেন। যে আকাশযান যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল, কুম্ভকর্ণের মৃত্যুর পর তা ধ্বংস করে ফেলেন রাবণ রাজা। লঙ্কাপুরী ধ্বংস হয় তারপর। এই যুদ্ধে নিবাত কবচরা প্রত্যক্ষভাবে রাবণকে সাহায্য করেনি। ফলে রামের জয়লাভে তাঁরাও নানা অসুবিধায় পড়লেন। আকাশযান তাই আর তৈরি করতে পারলেন না। ক্রমে দৈত্য আর অসুরদের প্রভাব কমতে থাকে। আর্য জাতিরাও শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। সাগরতলের রাজত্ব নিয়েই খুশি নিবাত কবচরা। সেখানে তাঁদের কোনো শত্রু ছিল না।

সমুদ্র থেকে শক্তি আহরণ করে তাঁরা মহা সুখে-শান্তিতে বাস করলেন এক যুগ। অনেক কিছু পেলে যা হয়! এরা হয়ে পড়লেন ভোগী, বিলাসী। ক্রমে নৃশংস, অবিবেচক। পৃথিবীর ওপরে যেতেন কেবল অন্যায় করতে। এদের অত্যাচারে ওপরের মানুষেরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়লেন। বিজ্ঞানকে যাঁরা বশে এনেছেন, তাঁরা অত্যাচারী হলে ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়।...হলোও তাই। যুদ্ধ ভুলে, এরা বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে ত্রাস সৃষ্টি করলেন!'

[সাত]

'নিরুপায় ওপরের মানুষেরা ওদের এই অত্যাচার নিয়তি বলেই মেনে নিয়েছিলেন। পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে, তখন অর্জুন ইন্দ্রের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শেখেন। শূন্য পথে উড়ে অস্ত্র আনার কৌশলও আয়ত্বে আনেন। শেষপর্যন্ত একদিন মাতলির সাহায্য নিয়ে আকাশ থেকে অস্ত্র হেনে নিবাত কবচদের সাগরতলের শক্তি-উৎপাদন-কেন্দ্র ধ্বংস করে দিলেন।

অন্ধকার নেমে এলো নিবাত কবচ নগর ভোগবতীতে। সেই অন্ধকারের সুযোগে মানুষ ও দেবতাদের মিলিত এক বাহিনী সাগরতলে নেমে, ভোগবতী আক্রমণ করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিলেন। ভয়ঙ্কর সেই ধ্বংস-যজ্ঞ। প্রতিটি যন্ত্র, প্রতিটি সুরঙ্গ গৃহ, মন্দির, এমনকি প্রতিটি নিবাত কবচকে হত্যা করা হয়। এই কাজে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জানতেন না, অশিক্ষিত কিছু নিবাত কবচ পাতাল নদীতে মাছ ধরতেন। নগরের বাইরে নদী-তীরের সামান্য এক গুহাতে তাঁরা বাস করতেন। আক্রমণ সেখানে হয় নি। ভয়ঙ্কর ধ্বংসের শেষে তাঁরা আটকা পড়েছিলেন এই অন্ধকারের বন্দী বাতাসের মধ্যে। পালাবার চেষ্টা করেছিলেন। নানা দিকে ছড়িয়ে গিয়ে ওপরে যাবার পথ খুঁজেছিলেন। পেয়েও ছিলেন। কিন্তু সে-পথ মাঝখানে ভাঙ্গা। এতো বিদ্যা বা বুদ্ধি কিছুই ছিল না তাঁদের, যে, নতুন করে কিছু শুরু করেন। শেষপর্যন্ত এই অন্ধকারকেই মেনে নিয়েছিলেন। তারপর এক এক করে কতো যুগ কেটে গেছে। ওদের চেহারায় বদল এসেছে। চোখ আর নেই। সেখানে চামড়ায় ঢাকা কোটর আছে। প্রায় কাঁচের মতো স্বচ্ছ ওদের দেহ। হাড় কঙ্কাল স্পষ্ট দেখা যায়। কাপড় পরা ভুলেছেন। আগুন কি তা

ভুলেছেন। খাদ্য বলতে কেবল নদীর অন্ধ মাছ। তা-ই খায় কাঁচা, খিদে পেলে। আমিও এখন ওদেরই মতো হয়ে গেছি। ওরা কথা বলেই না প্রায়। যা বলে, তা-ও এক-আধটা শব্দ মাত্র। ওরা জানে গুহার একদিকে একটা গোপন কক্ষে এক পরম সম্পদ লুকোনো আছে। তা ওদের কাছে রেখে গেছেন রাজা রাবণ। একদিন তিনি ফিরে আসবেন সেটা নিয়ে যাবার জন্যে। সেই সম্পদ ফেরত দিলেই ওদের মুক্তি। এই ভয়ঙ্কর জীবন আর ওরা বইবে না। পাতাল নদীর অতল গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে শেষ হয়ে যাবে। ভোগবতীতে আর কে-উ থাকবে না!

আমি যখন এখানে আসি, মোমবাতির আলোয় ওদের চেহারা দেখে আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল ওরা প্রেত। জীবন্ত কঙ্কাল। আমার চিৎকার শুনে ওরাও আতঙ্কে পাগলের মতো ছুটে গুহার মধ্যে লুকিয়েছিলেন। প্রচণ্ড শব্দ বা আলোর সাড়া ওদের একদম অজানা! তারপর আমি সাহস করে ওদের সঙ্গে ভাব করি। ওরা আমাকেই রাবণ রাজা ভাবে। সময়ের কোনো হিসেবই ওদের নেই। পৃথিবী যে কতো বদলে গেছে, তা ওরা জানে না। ওরা আমাকে সেই অমূল্য সম্পদ দেখায়। তা আর কিছুই না, ঐ আকাশযানের সম্পূর্ণ নক্সা! সে নক্সা লোহার পেটিতে যত্ন করে রাখা আছে। সময় কোনো ক্ষতি করেনি তার। ওরা আমাকে নক্সা নিয়ে চলে যেতে বলে। তারপরই ওরা অতল গহ্বরে ঝাঁপ দেবে দল বেঁধে। বহু কষ্টে ওদের থামাই। বোঝাই, আমি রাবণ রাজা বা তাঁর আপনজন কেউ নই। কেন ওরা মরতে চায় জিজ্ঞেস করাতে ওরা আমাকে নিয়ে যায় বহু দূরের এক ভয়ঙ্কর গুহায়। সে গুহায় কোমর-ডোবা জল, সে জল নোনা। সে-গুহার শেষ সমুদ্র কিনারে। কিনারের দেওয়াল বড্ড পাতলা। যে কোনো মুহূর্তে সমুদ্র ভেঙে ফেলবে! সেখানে ফাটল দিয়ে নোনা জল চুইতে শুরু করেছে। আর

খুব বেশি দিন লাগবে না সমুদ্র-তাণ্ডব ঘটতে। ওরা বলে মৃত্যু ওদের হবেই। সমুদ্র গ্রাস করবে সব গুহা। তার আগেই ওরা ওদের কাজ শেষ করে স্বেচ্ছায় মরতে চায়।··এই গুহার এই হলো ইতিহাস।'

থামলেন আপ্পালা রাজু। আমাদের কারও মুখে কোনো কথা নেই। সব শুনে আমরা অবাক!

আপ্পালা রাজুই বললেন, 'জানো, আমি ওদের মনে মিথ্যে আশা জাগিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমার মতো আরও মানুষ আসবে এখানে। তাঁরা এলে, সিমেণ্ট দিয়ে ঐ ভয়ঙ্কর গুহাটা আমরা বন্ধ করে দিতে পারবো। যুগ-যুগান্তর ধরে সমুদ্র আর তাহলে কোনো ভয় দেখাতে পারবে না ভোগবতীনগরের শেষ চিহ্নকে। পৃথিবীর মানুষ তা নিশ্চয়ই করবে। তারপর ডাক্তার আসবেন। তাঁরা তাঁদের নানা ওষুধ দিয়ে ওদের আরও তাজা করে তুলবেন। এই অন্ধকারেই যাতে ওরা আরও সুখে থাকতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন। আমি ফিরে যেতে পারিনি। সামান্য যে দড়িটা নির্ভর করে নীচে নেমেছিলাম, তা হঠাৎ আমার হাতের নাগালের অনেক বাইরে ছিঁড়ে গেল। কতো চেষ্টা করলাম, কতো উপায় করলাম, দড়ি আর ধরতে পারলাম না। খাবার ফুরলো, আলো ফুরলো, শেষ আলোতে আমার মনের কথা লিখে রেখে নেমে এলাম ওদের মধ্যে। তারপর···তারপর···এক যুগ কেটে গেছে। এক যুগ···। ওদের আমি বাঁচাতে পারিনি। আমিই ওদের মতো হয়ে গেছি। ভয়ঙ্কর গুহার শেষ পাঁচিলটাতে আরও ফাটল ধরেছে। নোনা জল কোমর ছাড়িয়ে বুক অবধি উঠেছে। ওরাও আর স্বপ্ন দেখেনা। মরার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছে।'

চুপ করে মাথা নীচু করলেন আপ্পালা রাজু। দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুরুজী জিজ্ঞেস করলেন, 'নিবাত কবচের সংখ্যা কতো এখানে?'

'আমি যখন এখানে আসি, তখন ছিল বাহাত্তর জন। একুশ জন

বাচ্চা ছেলে-মেয়ে। বাদবাকি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ আর মহিলা, প্রায় সমান সংখ্যায়। এখন আছে বোধহয় ঊনত্রিশ জন। কতো জন পুরুষ, কতো জন মহিলা, আর কতোই-বা বাচ্চা, ঠিক বলতে পারবো না। আমিও আশা হারিয়েছিলাম, তাই আর কোনো হিসেব রাখিনি। যাক্ এসব কথা।...এখন হাতে সময় কম, কাজ করতে হবে অনেক। প্রথমে তোমরা আলাপ করবে নিবাত কবচদের সঙ্গে। তারপরই তোমাদের ফেরত যাত্রা শুরু হবে। ফেরার পথে তোমরা লোহার পেটিটা সঙ্গে নেবে। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা জমা দেবে সরকারের কাছে। ইংরেজ সরকার শুনেছি বিজ্ঞানের ভক্ত। ওটা নিয়ে তাঁরা যা ভাল বোঝেন, তা-ই করবেন। আর জানাবে নিবাত কবচদের কথা। অনুরোধ করবে সরকারকে, যে করেই-হোক্ তাড়াতাড়ি ঐ ভয়ঙ্কর গুহাটাকে ভরাট করে সমুদ্রকে ঠেকাতে হবে।'

আয়াজ বলল, 'আপনি জানেন না, দেশ আমাদের স্বাধীন হয়েছে, বহুদিন হলো। সে-ই ঊনিশশো সাতচল্লিশ সালে।...'

'তাই নাকি, ভারি আনন্দের কথা।' বললেন আপ্পালা রাজু, 'স্বাধীন সরকার নিশ্চয়ই নিবাত কবচদের জন্য সব কিছু করবেন। তাহলে আর দেরি না। এখুনি নিবাত কবচদের সঙ্গে দেখা করেই ফিরবেন আপনারা। এখানে কাজ যতো তাড়াতাড়ি আরম্ভ করা যায়, ততোই ভালো।...আসুন আপনারা, আলোর মুখ ঢাকা দিয়ে।'

গুহা-ঘর থেকে নেমে পড়লাম নীচে। নদীর স্রোতের শব্দ যেন খুব বেড়েছে মনে হলো। দূরে কোথায় জলস্রোত ঝরে পড়ছে! আপ্পালা রাজু বললেন, 'নদীতে জোয়ার এসেছে। সাবধান! জলের কিনারে যাবেন না। জল হাত বার করে টেনে নেবে। এ জোয়ারের সঙ্গে সাগরের কোনো যোগ নেই, যোগ আছে বৃষ্টির। পৃথিবীতে ভীষণ দুর্যোগ চলছে এখন।'

লোপেস বলল, 'কী ভয়ঙ্কর কথা! ৩৭১ আর খোজা বেগকে চারজনে সামলাতে পারবে তো? যদি ভেসে যায় বোট দুটো!'

আমরা কেউই কোনো জবাব দিলাম না।

আপ্পালা রাজু বললেন, 'আমার অভিজ্ঞতা বলে, সাইক্লোন শুরু হয়েছে ওপরে। জল এতো বেশি আসছে নদীতে, যে, বহু দূরের অতল গহ্বরে ঝরে-পড়া জলের শব্দও ভেসে আসছে এখানে। তোমরা বোটে করে এসেছো এখানে? নাকি জাহাজে? জাহাজ কি ভেসে যাবে ঝড়ে?'

এ কথারও কেউ কোনো জবাব দিল না। আমরা এগোলাম। নদীর পাশ দিয়েই পথ। সে পথ জায়গায় জায়গায় সরু। এখানকার অন্ধ মানুষগুলো যে কি করে ঐ পথে চলাফেরা করেন, ভাবলে অবাক হতে হয়!

কিছুটা এগিয়েই বাঁ-দিকে একটা বিশাল যন্ত্র পড়ল। অটুট যন্ত্রটা অন্ধকারে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে। কোনো অংশই ভাঙ্গচুর হয়নি। কী অপূর্ব গড়ন যন্ত্রটার!

আপ্পালা রাজু বললেন, 'এটা জল সরবরাহ করার যন্ত্র। পৃথিবীর সব বৈজ্ঞানিক আর যন্ত্রবিদদের এটা দেখার জন্যেই এখানে আসা উচিত। শক্তির যোগান পেলে বোধহয় এখনও কাজ করতে পারে। গায়ে হাত বুলিয়ে দেখেছি, ওতে মরচে ধরেনি।'

অবাক বিস্ময়ে ওটা পার হয়ে গেলাম। তারপর পথ চওড়া হতে লাগল। লোপেস মাঝে মাঝে দূরে আলো ফেলে দেখছিল। হঠাৎ বেশ কিছুটা আগে পাথুরে দেওয়ালের গায়ে গুম্ফা মতো কতোকগুলো চৌকোনা খোপ দেখা গেল। তার সামনে ওগুলো কি নড়াচড়া করছে! অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ওদের চেহারা। আপ্পালা রাজু বললেন, 'আমরা এসে গেছি। আলো নেভাতে হবে না। ওদের আলোর অনুভূতি নেই। তবে জোরে কথা বলো না, চেঁচিও না, ওরা সইতে পারবে না। ওরা অসভ্য জংলী নয়, ওরা

নিবাত কবচ। যুগ-যুগান্তর ধরে অন্ধকারে বাস করছে ওরা, তাই ওদের দেহে কাপড় নেই। আর ওসব ওরা এখানে পাবে কোথায়? এখানে নদীতে একধারে একটা বাঁধ আছে, সেখানে মাছ ধরে ওরা। অন্ধ মাছ। তাই খেয়ে বেঁচে আছে। অন্ধকারে থাকার জন্যে অমন কাঁচের মতো চেহারা ওদের। তার জন্য ভেতরের কঙ্কাল অত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওরা প্রেত নয়। ওরা এগিয়ে এসে তোমাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখবে। ওদের হাতের ছোঁয়ায় তোমাদের গায়ে ভয় বা কাঁপুনি জাগলেও স্থির থেকো। দোহাই, সরে যেয়ো না, কিম্বা আঁৎকে উঠো না। তাহলেই লজ্জায় ওরা গুহার মধ্যে চলে যাবে। আর তোমাদের সামনে বার হবে না কিছুতেই।'

ওরা কিলবিল করে এগিয়ে এলেন। ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা-বুড়ো, সকলেই। কী বিকট চেহারা! কী ভয়ঙ্কর দেখতে ওদের!

আমাদের সবার সারা দেহে ওরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে হাত বুলাতে লাগলেন। বুড়োবুড়ি দু-একজনের মুখে ফিসফিসানি শোনা গেল: 'দাওতা, দাওতা, দাওতা!...'

ওরা আমাদের দেবতা ভেবেছে।

ছোঁয়া দেবার শেষে, হঠাৎ একসঙ্গে সবাই পিছিয়ে গিয়ে আমাদের ঘিরে গোল হয়ে বসলেন। আপ্পালা রাজু বললেন, 'এবারে ওরা তোমাদের খেতে দেবে কাঁচা মাছ। সে মাছ তোমরা হাতে ধরে নেবে। যে দেবে তাঁর মাথায় হাত রাখবে। সে মাছ তোমরা খাও চাই না-খাও, কিছুক্ষণ পরে মুখ দিয়ে 'আঃ' করে একটা আওয়াজ করবে। তা শুনে ওরা বুঝতে পারবে, তোমরা তৃপ্তি পেয়েছো। তার পরে কথাবার্তা হবে। অবিশ্যি আমাকেই দোভাষীর কাজ করতে হবে।'

ওদের মধ্যে থেকে একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। থেমে থেমে কী যেন বললেন, বোধহয় আমাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। অল্প

কটা কথা মাত্র উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ। ওর কথা শেষ হতেই পাঁচ জন উঠে দাঁড়ালেন পিছন থেকে। তাঁদের হাতে কী যেন রয়েছে। আস্তে আস্তে কিছুটা এগিয়ে এসে ওরা থামলেন। আপ্পালা রাজু কি



যেন বললেন। একজন এগিয়ে এলেন গুরুজীর দিকে। সামনে এসে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে ধরলেন হাতের মাছ। একটু ইতস্তত করে সেই মাছ হাতে তুলে নিলেন গুরুজী। একটা হাত রাখলেন লোকটার মাথায়।

এমনিভাবেই এক এক করে প্রত্যেকের হাতে মাছ দিলেন ওরা! আমার মাছটা পৃথিবীর ওপরের নদীর সাধারণ মাছের মতোই দেখতে। তবে চোখ নেই মাছটার। গা এতো স্বচ্ছ যে ভেতরের কাঁটাগুলো স্পষ্ট দেখা গেল।

আমাদের মাছ দেওয়া শেষ হতেই, ওরা ওদের নিজেদের মধ্যে মাছ বিলি করলেন। এর পর খাওয়ার পালা। ওরা বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই, আঁশ কাঁটা সুদ্ধু, সবটুকু মাছ চিবিয়ে খেয়ে ফেললেন। ওদের খাওয়া শেষ হতেই, আমরাও মুখ দিয়ে আওয়াজ করলাম। শুনে ওরা ভারি খুশি!

আপ্পালা রাজু কিন্তু তাঁর ভাগের মাছ আরাম করেই খেয়েছিলেন। খাওয়া শেষ করে বললেন, 'নারায়ণ, তুমি তো এ দলের নেতা? তুমিই নিবাত কবচদের প্রধান শালকটঙ্কচের সঙ্গে কথা বলবে। উনি যা প্রশ্ন করেন তার যথাযথ উত্তর দেবে। মনে রেখো, এদের জানার আগ্রহ এখনও আছে। অতীতের সব স্মৃতি এখনও মুছে যায়নি মন থেকে।'

গুরুজী বললেন, 'বেশ, তাই হবে। কথা আরম্ভ হোক্।'

যে বৃদ্ধ আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনিই উঠে দাঁড়ালেন। দল ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে এসে এক জায়গায় একটু বসলেন। খানিক ভেবে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন থেমে থেমে: 'আপনারা খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আপনাদের দেখা পেয়ে আরও বেশি খুশি হয়েছি।'

'আপনারা আলোর দেশের লোক, আপনারা দেবতা। রাক্ষসদের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ কি থেমে গেছে?'

'আপনি ভুল করছেন। আমরা দেবতা নই, আমরা মানুষ।'

'মানুষ··· ? আপনারা তাহলে আপ্পালা রাজুর জাতের লোক? তাহলে আমাদেরও বন্ধু! ওর ফিরে যাবার দড়ি ছিঁড়ে গেছে। দয়া করে ওকে আপনাদের সঙ্গে ওপরে নিয়ে যান।'

'যাবো। তবে তার আগে একথাও বলতে চাই, ওপরে গিয়ে আপনাদের কথাও আমরা সবাইকে জানাবো। তারপর ফিরে আসবো আপনাদের জন্যে ব্যবস্থা করতে।'

'খুব আনন্দের কথা। আপনারা ভয়ঙ্কর গুহাটা বন্ধ করে দিন। তাহলেই আমরা বাঁচবো। আর শুনেছি ওপরের নদীতে অনেক মাছ আছে, তা এখানে পাঠিয়ে দিন। সে-ই হবে সব থেকে বড় বন্ধুর কাজ।'

'আমরা চেষ্টা করবো। নিশ্চয়ই আমাদের সরকার সব কথা শুনে, যোগ্য ব্যবস্থা করবেন।'

'আর একটা কাজ করতে হবে আপনাদের। যে অমূল্য সম্পদ রাবণ রাজা আমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছেন, তা নিয়ে যাবেন সঙ্গে করে। যাঁর সম্পদ তাঁকে বা তাঁর আপনজনদের ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবেন। তবেই আমরা দায় থেকে মুক্তি পাবো। সেই সম্পদ আর আগলে রাখতে পারছি না।'

'হ্যাঁ, তার ব্যবস্থাও আমরা করবো।...কোথায় সেই সম্পদ ?'

'আমার দুই পুত্র পুলোমা আর অকম্পন এখন আপনাদের নিয়ে যাবে সেই অমূল্য সম্পদের গুহায়। লোহ পেটি গ্রহণ করে আপনারা যাত্রা করবেন।...আপনাদের যাত্রা শুভ হোক্। বিদায় বন্ধু মানুষরা।'

'বিদায় বন্ধু নিবাত কবচরা। আবার আমরা ফিরে আসছি অল্প কিছুদিনের মধ্যেই।'

কথা শেষ হতেই সবাই আবার আমাদের ঘিরে ধরলেন। আবার আমাদের সারা গায়ে-মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগলেন। আমাদের জামাকাপড়, জুতো, চোখ, সবই ওদের অবাক করে দিলো। বারবার হাত বুলিয়েও যেন আশ মেটেনা!

একজনের হাতে আমার টর্চটা দিতেই ভয় পেয়ে ওটা মাটিতে ফেলে দিলেন। অন্য একজন আমার জামা ধরে টানতে লাগলেন। ভেবেছেন যেন আমার গায়ের চামড়াই ঢিলে! চোখে হাত দিয়ে ওরা রীতিমত উত্তেজিত! হঠাৎ কে-যেন কি বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ওরা আমাদের ছেড়ে দিলেন। আস্তে আস্তে পিছিয়ে গিয়ে আবার বসে পড়লেন। আপ্পালা রাজু বললেন, 'চলুন, ফেরার সময় হলো। দেরি করবেন না। অনেকটা যেতে হবে।'

আমরা সবাই নদীর ধারের পথের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। লোপেস বলল, 'আগামীবারে ভালো মুভি-ক্যামেরা সঙ্গে আনবো। ওদের ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে অবাক করে দেবো সবাইকে।'

নিবাত কবচদের মধ্যে থেকে দু-জন অল্পবয়স্ক ছেলে এগিয়ে

এলো আমাদের দিকে। ওরাই শালকটঙ্কচের দুই ছেলে। ওরা কাছে আসতেই আপ্পালা রাজু বললেন, 'চলো, এগোও সবাই। সামনে এখনো অনেক পথ।'

নদীর তীরে পৌঁছাতেই জলের প্রচণ্ড আওয়াজ শুনতে পেলাম। আওয়াজ যেন বেড়েছে বলে মনে হলো। তবে কি পৃথিবীর ওপরে দুর্যোগ আরও বেড়েছে! ভীষণ চিন্তা নিয়ে এগোলাম। নদী গুহা-মুখের পাথর বেয়ে নীচে নেমেই থামলেন আপ্পালা রাজু। পিছনে ফিরে পুলোমা আর অকম্পনকে কি যেন বললেন। ওরা তাড়াতাড়ি নীচে নামল। নেমেই থমকে গেল। আমরাও এক এক করে নামলাম। ব্যাপারটা যে কি, তখনই বুঝতে পারলাম। নীচে পাতা ডোবা জল থৈ-থৈ করছে চারদিকে! আসার সময়ে তো ছিল না! পুলোমা আর অকম্পন নীচু হয়ে সে জল তুলে মুখে দিল। তারপরই থু-থু করে ফেলে দিল। আয়াজ ও জল মুখে দিয়ে বলল, 'এ তো নোনা জল। তার মানে এ জল সাগরের। ভয়ঙ্কর গুহায় কি তাহলে ফাটল ধরেছে বেশি?'

আপ্পালা রাজু বললেন, 'সর্বনাশের শেষ-সময় ঘনিয়ে এলো বুঝি! এদিকে কোথাও নোনা পাথর নেই গুহাতে। ওপরে তুফান শুরু হয়েছে। প্রচণ্ড তুফান! ক্ষেপা সমুদ্র আছড়ে পড়ছে ফাটা দেওয়ালের ওপরে। তাই এতো জল। অমূল্য সম্পদের গুহায় যাওয়া যাবে না আর। এখুনি ফিরতে হবে। তাড়াতাড়ি ও গুহা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। নইলে গুহার মধ্যে জলে ডুবে শেষ হয়ে যাবে নিবাত কবচেরা।'

ফিরে দাঁড়িয়ে কি যেন বললেন পুলোমা আর অকম্পনকে। ওরা অমনি নদী গুহার মুখ বেয়ে উঠতে শুরু করল। বেশ বুঝতে পারলাম, ভীষণ ভয় পেয়েছে ওরা।

'ওরা···ওরা তবে ফিরে যাক।' বললেন আপ্পালা রাজু, 'ভীষণভাবে সাবধান করে দিক নিবাত কবচদের। আর তোমরা···তোমরাও

দাঁড়িয়ে থেকো না, চলো, তাড়াতাড়ি চলো, তোমাদের পার করে দিয়ে আসি।'

ছপ্ ছপ্ করে জল ভেঙ্গে তাড়াতাড়ি এগোলাম। বেশ ভয় পেয়েছি সকলেই। হঠাৎ গুহার দেওয়াল ধ্বসিয়ে সমুদ্র যদি ঢুকে পড়ে, তো আমাদেরও শেষ হয়ে যেতে হবে। কিছুটা এগোতেই বুঝলাম, জল বাড়ছে! তার মানে দেওয়ালের ফাটলও বাড়ছে। দেখতে দেখতে জল প্রায় কোমর অবধি পৌছাল। জল ভেঙ্গে চলতে বেশ কষ্ট হতে লাগল। হঠাৎ অন্ধকারে সামনে ধ্বসটা দেখতে পেলাম। ফোঁকরে প্রায় ডুবু-ডুবু জল।

'দম ধরে সাহস করে পার হয়ে যাও তোমরা তাড়াতাড়ি। আমি যাবো না।'

'তা হয় না আপ্পালা রাজু।' বললেন গুরুজী, 'তোমাকে না নিয়ে আমরা যেতে পারবো না।'

'আমার জীবনে আর-একবার এমন হয়েছিল। সেবারে ওপরের ঝড় থেমে জল নেমে গিয়েছিল কিছু দিনেই। এবারেও তাই হতে পারে। আমি যাবো না। তোমরা ফিরে আসবে সে আশাতেই আমি এখানে থাকবো ওদের নিয়ে। ওরা যদি না-বাঁচে, তো আমার আর বেঁচে দরকার নেই। নাও, কথা বাড়িও না নারায়ণ, ফোঁকরে ঢোকো। এরপর জলে ডুবে যাবে ফোঁকর।'

কোনো কথাই শুনলেন না আপ্পালা রাজু। আমরা এক এক করে দম ধরে ওপারে পৌঁছালাম। ওপারেও পাথরের ধ্বসের মধ্যে দিয়ে চুঁইয়ে অনেক জল জমা হয়েছে। কাইকোয়াড় বললেন, 'আর দাঁড়িও না। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করো।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করতেই হঠাৎ দূরে কোথায় যেন প্রচণ্ড শব্দে কি ফেটে পড়ল। কানে তালা ধরে গেল! গুহার বন্ধ হাওয়া প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল। আমরাও কী-রকম যেন থরথর করে কেঁপে উঠলাম।

'দেওয়াল ফেটেছে।' বলল আয়াজ, 'আপনারা হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করুন। দৌড়োন, দৌড়োন।···ধ্বস ফাটিয়ে জল এলো বলে।'

আমরা প্রাণপণে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম। দু-চার পাক খেয়ে উঠতেই পিছনে হুড়মুড় করে ভীষণ শব্দ তুলে কি যেন ভেঙ্গে পড়ল। ফিরেও তাকালাম না আমরা। হাতের আলো গুলো সিঁড়িতে ফেলে ছুটে ওপরে উঠতে লাগলাম।

লোপেস হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'দড়ি-মইয়ের কাছে পৌঁছে গেছি। থামা চলবে না। আর একটু ছুটতে হবে···।'

চাটানে উঠেই আলো জ্বালিয়ে গুরুজীকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে বললাম। তিনি ফোঁকর পার হয়ে গিয়ে দড়িতে টান দিয়ে সংকেত দিতেই আয়াজকে ঠেলে তুলে দিলাম। তারপর কাইকোয়াড়। তিনি সংকেত দিতেই লোপেসকে ঠেলে তুলে দিয়ে মইতে পা দিলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে ঠিক নীচের সিঁড়ি দিয়ে ঘূর্ণী পাক খেয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠে এলো এক জলস্তম্ভ। প্রাণপণে মই আঁকড়ে একটু একটু করে এগোলাম আমি। মনে হলো হাত ছিঁড়ে ঐ জলস্তম্ভ আমাকেও ওর পাকে আটকে আছড়ে ফেলবে দেওয়ালে। ফোঁকর ঠেলে ওপরে উঠতেই আয়াজ আমার হাত ধরে টেনে তুলে নিলো। ছুট, ছুট—আবার আমরা সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম, পিছন পিছন তেড়ে আসতে লাগল জলস্তম্ভ। শেষ ধ্বস পার হয়ে অর্ধেক সিঁড়ি ডুবিয়ে জল ঘুরপাক খেতে লাগল এক জায়গাতেই। আওয়াজ আর জলের শব্দে ওপরের আলোগুলো আগেই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন এ্যাফোন্সো সাহেব। আমাদের্ নাম ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে জাফরকে সঙ্গে নিয়ে নেমে এসে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপার কি?···কী হয়েছে?' গুরুজী করুণ ভাবে নীচের জলের ঘূর্ণী দেখিয়ে দিলেন আঙ্গুল তুলে।

'সবাই ঠিক আছে তো?' ভীষণ ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞেস করলেন

এ্যাফোন্সো সাহেব, 'কিন্তু···কিন্তু কী ব্যাপার! এতো জল এলো কোথা থেকে!'

আস্তে আস্তে কাইকোয়াড় বললেন, 'নীচে সমুদ্রের দেওয়াল ধ্বসে পড়ে সমস্ত গুহা জলে ডুবে গেছে। ওই জল সমুদ্রের!



জলে ডুবে গেছেন নিবাত কবচরা, ডুবে গেছেন আপ্পালা রাজু। শেষ হয়ে গেল একটা যুগ, একটা সভ্যতা। যার কথা আর কোনোদিনই মানুষ জানতে পারবে না।'

'কি বলছো তুমি!' ব্যস্ত হয়ে বললেন এ্যাফোন্সো সাহেব। 'আমি···আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

লোপেস বলল, 'হায়, হায়, আরও আগে কেন আমরা এখানে এলাম না! হায়, কেন আপ্পালা রাজুর দড়িটা ছিঁড়ে গেল! না ছিঁড়লেই তো পারতো!…হায় হায়!'

ঝড়ে বোট জায়গায় রাখতে পারেনি আলি রাজা আর কুট্টি আলি। আমি আর আয়াজ ঝড়ের মধ্যে ভেসে উঠে ভীষণ বিপদে পড়লাম। বাধ্য হয়েই পাতাল গুহার অন্ধকারে প্রায় দুটো দিন কাটাতে হলো আমাদের। ওদিকের জল আর তেড়ে আসেনি! নেমেও যায়নি। তার মানে নীচের গুহার সবটাই পুরোপুরি জলে ভর্তি হয়ে গেছে। ও জল আর কোনোদিনও নেমে যাবে না।

আমাদের কাছে সব কথা শুনে দু-দিন কেমন যেন চুপ করে থাকলেন এ্যাফোন্সো সাহেব। গুরুজীও দুঃখে-শোকে প্রায় উপোস করেই কাটালেন দু-দিন।

ঝড় থেমে গেলে ফিরে এলো বোট দুটো। ক-দিন পরেই এক সকালে আমরা নৌকো থেকে ডাঙ্গায় নামলাম। চালিয়েমে। অন্ধকারে বন্দী বাতাসের রাজত্বে আর কোনোদিনও ফিরে যেতে হবে না! আমাদের সবার ভারি মন খারাপ হয়ে গেল!